KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৯/১ ১৯/২ ১৯/৩ ১৯/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৪ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৪ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৪ মাঘ - চৈত্র ১৩৬৪ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৪

দগ্ধ বিশুষ্ক জমির বুক সিক্ত করতে চাই জল···মানুষ
জীবজন্তু ও শস্যকে বাঁচাতে চাই জল···খরার কবল মাস রুক্ষ
বিবর্ণ মাটিকে সরস করে তুলতে চাই জল···চাই তৃষ্ণার
জল···চাই শক্তি উৎপাদনের জন্য জল।

নদীতে বাঁধ লাগাও···

ভবিষ্যৎ সুখসমৃদ্ধির আশায় চারিদিকে বাঁধনির্মাণ ভারতের বৃহৎ
পরিকল্পনাগুলির প্রতিচিত্র···আর, রাস্তা থাকুক চাই নাই
থাকুক, দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে, বাঁধনির্মাণের
স্থানগুলিতে লোকজন ও মালপত্র বহন করে নিয়ে চলেছে
একমাত্র ইউনিভার্সাল 'জীপ'—অধিক মালপত্র টানতে
সক্ষম একমাত্র বাহন—বিখ্যাত ৪-চাকার উইলিস গাড়ী।

ইউনিভার্সাল 'জীপ'
Jeep
একালের সবচেয়ে উপযুক্ত গাড়ী
ভারতে ধাপে ধাপে নির্মাণে রত
মাহীন্দ্র এণ্ড মাহীন্দ্র লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • দিল্লী • মাদ্রাজ

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

মওলানা আজাদের কাহিনী ৩২১
অরুণ মিত্র ॥ ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে ৩৩৩
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ সেই বুড়োটে লোকটার জন্যে ৩৩৪
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ বিপ্রলব্ধ ৩৩৫
অশোক মিত্র ॥ মাতিস, রঙ্, নৈরাজ্য ৩৩৬
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ নীল রাত্রি ৩৪১
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : প্রাচীন যুগ ৩৯০
অমলেন্দু বসু ॥ আধুনিক সাহিত্য ৪০২
সমালোচনা—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য,
কমলকুমার মজুমদার ও নৃপেন্দ্র সান্যাল ৪২৮

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

দুরন্ত গতিকে

ব্যাহত করবেন না

ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা—
সমুন্নততর ভারত গঠনে যা' কিছু
সহায়ক, তার সব কিছুই অধিকতর
পরিমাণে বহন করতে
গিয়ে সময়কেও হার মানাতে
চাইছি আমরা। এই মহৎ
প্রচেষ্টার অংশীদার হিসাবে
আপনার দানও যথেষ্ট। রেলের
চাকার দুরন্ত গতিকে কেউ যদি
ব্যাহত করতে চায়, আপনি
সহ্য করবেন কখনও ?
আমাদের এই গুরু দায়িত্বের
সুষ্ঠু সম্পাদনে আপনার
সহযোগিতা উৎসারিত হোক।
আপনার সাহায্যপ্রার্থী আমরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ঊনবিংশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

মওলানা আজাদের কাহিনী

[মওলানা আজাদের ইচ্ছা ছিল যে তিন খণ্ডে তিনি নিজের জীবনী সম্পূর্ণ করবেন। প্রায় দুই বছর আগে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়, এবং তিনি আত্মকথা বলতে শুরু করেন। তিনি উর্দুতে বলে যেতেন, এবং তার কথনের ভিত্তিতে ইংরিজিতে বইখানির রচনাও হয়। দ্বিতীয় খণ্ড তিনি সম্পূর্ণ দেখে এবং অনুমোদন করে যেতে পেরেছিলেন, এবং স্বতন্ত্রভাবে তার প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুই বলতে চাননি, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড আত্মকথার খসড়া তৈরী হবার পরে প্রথম খণ্ডে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতেও রাজী হন। প্রথম খণ্ডের জন্য একটি সংক্ষিপ্তসারও তৈরী করা হয়, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে তাকে প্রকাশ করার কথা ঠিক হয়। সেই সংক্ষিপ্তসারের বাঙলা অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। পরে আরো দুই তিনটি অধ্যায় প্রকাশেরও ইচ্ছা আছে। প্রথম খণ্ডের কাজ আর সমাপ্ত হ'ল না, তৃতীয় খণ্ডের রচনাও শুরু সম্ভব হয়নি।—**হুমায়ুন কবির**]

বাবরের আমলে আমার পূর্ব পুরুষেরা হেরাট থেকে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁরা প্রথমে আগ্রায় বাস স্থাপন করেন, কিন্তু পরে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হন। আমাদের পরিবারের তখন থেকেই লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক ছিল এবং আকবরের সময়ে ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত বলে মওলানা জামালউদ্দিন খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আমাদের পরিবার সাংসারিক ব্যাপারের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে এবং আমাদের বংশের কয়েকজন মোগল দরবারে উচ্চপদ লাভ করেন। শাজাহান বাদশাহের আমলে মহম্মদ হাদী আগ্রা দুর্গের ফৌজদার বা গভর্ণর হয়েছিলেন।

আমার বাবার নানা ছিলেন মৌলানা মনওয়ারউদ্দিন। মোগল আমলে রুকনুন মুদারাসিসন বলে একটি পদ শাজাহানের আমলে স্থাপিত হয়। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য সরকারি কাজ কর্মের তদারক করবার উদ্দেশ্যেই পদটির সৃষ্টি হয়েছিল। পণ্ডিত ও শিক্ষকদের যে সমস্ত সম্পত্তি অথবা পেনসন দেওয়া হত, সেগুলির তদারক পদাধিকারীর অন্যতম কর্তব্য ছিল। আজকালকার দিনে ডিরেক্টার অব এডুকেসনের যে কাজ, বোধ হয় তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। মোগলরাজের ক্ষমতা তখন কমে এসেছে কিন্তু এ সমস্ত উচ্চ পদগুলি তখনও বজায় ছিল। মোগল আমলের সায়াহ্নে যে সব রুকনুন মুদারাসিসনের নিয়োগ হয়েছিল, মওলানা মনওয়ারউদ্দিন তাঁদের অন্যতম।

আমার পিতা মওলানা খয়েরউদ্দিনের বাল্যকালেই আমার পিতামহের মৃত্যু হয়। মৌলানা মনওয়ারউদ্দিন তাই তাঁকে লালনপালন করে বড় করেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের

বছর দুই আগে মওলানা মনওয়ারউদ্দিন দেশের অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে পড়েন এবং স্থির করেন যে মক্কায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। যখন তিনি ভূপাল পৌঁছালেন, তখন নবাব সিকান্দার জাঁহা বেগম তাঁকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেন। তিনি ভূপালে থাকতে থাকতেই বিপ্লব শুরু হয় এবং প্রায় দুই বৎসর ভূপালেই থাকতে বাধ্য হন। বিপ্লবের শেষে তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন, কিন্তু সেখানেই মৃত্যু হওয়াতে তাঁর আর মক্কায় যাওয়া হয়ে উঠল না।

আমার বাবার বয়স তখন ২৫ হবে। তিনি মক্কায় গিয়ে বাড়ি ঘর তৈয়ারী করে বসবাস করতে শুরু করেন এবং শেখ মহম্মদ জাহেদ ওয়াত্রীর কন্যাকে বিবাহ করেন। শেখ মহম্মদ জাহেদ মদিনার এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম আরব দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার পিতাও দশ খণ্ডে এক আরবী গ্রন্থ রচনা করে মিশরে প্রকাশিত করেন এবং সমস্ত মুস্লিম দুনিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকবার তিনি বোম্বাই আসেন এবং একবার কলকাতায়ও এসেছিলেন। দুই সহরেই বহু লোক তাঁর ভক্ত এবং শিষ্য হয়। ইরাক সিরিয়া এবং তুর্কী দেশেও তিনি এই সময় ভ্রমণ করেন।

মক্কা সহরের লোকে নহর জুবেদা থেকে পানীয়জল সংগ্রহ করত। খলিফা হারুণ অল রসিদের স্ত্রী বেগম জুবেদা এ নহরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কালক্রমে নহরটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং সহরে জলকষ্ট দেখা দেয়। হজের সময় জলের সবচেয়ে বেশী অভাব হ'ত এবং হাজীদের কষ্টের সীমা থাকত না। আমার পিতা নহরটির সংস্কার করেন। তিনি ভারতবর্ষ, মিশর, সিরিয়া এবং তুর্কী দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং নহরটির মেরামত এবং অনেক উন্নতি করেন। আগেকার দিনে বেদুইনরা এসে মধ্যে মধ্যে নহরটির ক্ষতি করত। আমার বাবা যে ভাবে মেরামত করান, তার ফলে নহর নষ্ট করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুলতান আবদুল মজিদ তখন তুরস্কের সম্রাট ছিলেন। আমার পিতার এই সমস্ত সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান তাঁকে প্রথম দর্জার মজিদি মেডাল প্রদান করেন।

২

১৮৮৮ সালে মক্কা সহরে আমার জন্ম হয়। ১৮৯০ সালে আমার পিতা সপরিবারে কলকাতায় আসেন। কিছুকাল আগে জেদ্দায় পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেখানকার ডাক্তারেরা তাঁর চিকিৎসা করেন কিন্তু হাড় ভাল করে জোড়া লাগাতে সক্ষম হন না। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে বলেন যে কলকাতার বড় ডাক্তারেরা ভাঙ্গা হাড় ঠিক করে দিতে পারবেন। বাবার বেশীদিন কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তাঁর শিষ্য এবং ভক্তেরা কিছুতেই তাঁকে ছাড়ল না। কলকাতায় আসবার বছর খানেক পরে আমার মার মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

আমার বাবা প্রাচীন জীবন-রীতিতে বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁর একেবারেই আস্থা ছিল না। তাই আমাকে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার কথা তিনি একেবারেই ভাবেননি। তিনি বলতেন যে আধুনিক শিক্ষার ফলে ধর্ম বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচীন রীতিতেই তিনি আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সেকালে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যে সনাতনী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে ফারসী এবং পরে আরবী পড়ত। ভাষাদুটিতে খানিকটা দক্ষতা লাভ

করবার পরে তাদের দর্শন, জ্যামিতি, গণিত এবং এলজেব্রা পড়ান হ'ত। ইসলামী শরিয়ত শিক্ষাও এ শিক্ষা প্রণালীর এক জরুরী অঙ্গ ছিল। বলা বাহুল্য সে সমস্ত শিক্ষাই আরবীর মাধ্যমে হত। আমার বাবা আমার পড়ার ব্যবস্থা বাড়ীতেই করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে আমি কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হই। কলকাতা মাদ্রাসার তখনকার দিনে বেশ খানিকটা খ্যাতি ছিল, কিন্তু এ মাদ্রাসাটি সম্বন্ধেও বাবার ধারণা বিশেষ ভাল ছিল না। প্রথম প্রথম তিনি আমাকে নিজেই পড়াতেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেক বিষয়েই দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছে আমি শিক্ষা পাই।

প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ ২০/২৫ বছর বয়সে তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করত। নিজের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই কিছুদিন অন্য ছাত্রকে পড়াতে হ'ত। উদ্দেশ্য ছিল যে অধ্যাপনার দ্বারা প্রমাণ হবে যে অধ্যয়ন ঠিক হয়েছে। আমি ১৬ বছর বয়সেই তখনকার প্রচলিত শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেছিলাম। আমার বাবা তখন জন পনেরো ছাত্রের শিক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। তাদের আমি দর্শন, গণিত ও ন্যায়-শাস্ত্র পড়াতাম।

এর কিছুদিন পরে আমি প্রথম স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর লেখা আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করে। পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না হলে আধুনিক যুগে কাউকে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত বলা চলে না, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না। আমি ঠিক করলাম যে ইংরাজী শিখতে হবে। মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ জাফরী তখন প্রাচ্য শিক্ষার দফতরে প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। তাঁকে আমি আমার মনের কথা খুলে বললাম। তিনি আমাকে ইংরাজী অক্ষর শেখান। পিয়ারীচাঁদ সরকারের ফার্স্ট রিডার তিনিই আমাকে দেন। ভাষায় একটু দখল হ'তেই আমি বাইবেল পড়তে শুরু করি। ইংরাজী, ফারসী এবং উর্দু বাইবেল পাশাপাশি রেখে আমি পড়তাম, তার ফলে ইংরাজী রচনা বুঝতে আমার বেশী কষ্ট হত না। অভিধানের সাহায্যে ইংরাজী খবরের কাগজও পড়তে শুরু করলাম। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী বই পড়তে শিখলাম। বিশেষ করে ইতিহাস ও দর্শনের বই আমার ভাল লাগত এবং এই দুই বিষয়ে বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম।

৩

আমার জীবনে এসময়ে এক মানসিক সংকট দেখা দেয়। আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, পুরুষানুক্রমে সে বংশে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমার পরিবারে সকলেই প্রচলিত আচার পদ্ধতি বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে মেনে চলতেন। ধ্রুপদী রীতি-নীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হোক একথা কেউ পছন্দ করতেন না। অথচ আমার মনে তখন এক নতুন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতি কিছুকেই আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিলাম না। পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা ও প্রথম জীবনের অধ্যয়নে যা শিখেছিলাম, এখন কিছুতেই তা আমার মন মানছিল না। আমার মনে হ'ল যে নিজের চেষ্টায় সত্য পথ খুঁজে বের করতে হবে। সব সময়ে যে সচেতনভাবে এসব কথা ভেবেছি তা নয়, কিন্তু তবু এই সময় থেকেই পারিবারিক প্রতিবেশ অতিক্রম করে আমি নিজের জীবন-দর্শন খুঁজতে শুরু করি।

মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ আছে তাদের ঝগড়াঝাটি থেকেই আমার মনে প্রথম সন্দেহের সূত্রপাত হয়। শিয়া সুন্নীই হোক অথবা হানিফি, শাফী মালেকী অথবা হাম্বেলী হোক, সকল মুসলমান টীকাকারই দাবী করেন যে কোরাণ তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি। একথা মানলে তাঁদের পরস্পরের এত বিরোধিতার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যে ভাবে প্রত্যেক ফিরকা বা দল অন্য দলকে ভ্রান্ত এবং অবিশ্বাসী বলে নিন্দা করে, তা দেখে আমার সন্দেহ আরো গভীর হয়ে উঠল। যেখানে এত মতভেদ, সেখানে নিজ নিজ মতবাদের উপর এত অন্ধ বিশ্বাস কি করে সমর্থন করা যায় সে কথা কিছুতেই আমার বোধগম্য হল না। ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে ইমাম ও আলেমদের মধ্যে এত মতভেদ দেখে ধর্ম সম্বন্ধেই আমার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এল। সবাই বলে যে ধর্ম সার্বজনীন সত্যকে প্রকাশ করে। যদি তাই হবে, তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বা এত মতভেদ ও মনান্তর কেন? আর মতভেদ থাকলেই বা তারা পরস্পরকে এত ঈর্ষা ও দ্বেষের চোখে দেখে কেন? প্রত্যেক ধর্মের লোকেই দাবী করে যে তার ধর্ম সত্য এবং বাকী সমস্ত ধর্ম মিথ্যা, এ দাবীরই বা যৌক্তিকতা কোথায়?

প্রায় দু তিন বছর ধরে নানা সন্দেহ ও দ্বিধা আমাকে পীড়া দিয়েছে, কিছুতেই মনস্থির করতে পারিনি। আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছুতেই সন্দেহের নিরসন হচ্ছিল না। এক এক সময় এক এক রকমের ভাবনা আমার মনে আসত। পারিবারিক প্রতিবেশ এবং আবাল্য শিক্ষার ফলে যে সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার আমার মনে দানা বেঁধেছিল, অবশেষে একদিন তারা সব জীর্ণ পাতার মত খসে পড়ল। স্থিরভাবে জানলাম যে প্রচলিত রীতিনীতি আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। তখনই সিদ্ধান্ত করলাম যে নিজের পথ নিজেই তৈরী করে নেব। এই সময় আমি আজাদ নাম গ্রহণ করি। আজাদ অর্থ স্বাধীন। এই নাম গ্রহণ করে আমি ঘোষণা করলাম যে বংশপরম্পরায় যে সব বিশ্বাস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলাম সে সমস্ত বন্ধন আজ থেকে বর্জন করলাম। আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে আমার মানসিক পরিবর্তনের পূর্ণতর বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল।

এই সময়েই আমার রাজনৈতিক মতামতও বদলাতে শুরু করে। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও বিভিন্ন সরকারি হুকুমের ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন এক নতুন তাঁরতা লাভ করল। বাংলা দেশের প্রতি লর্ড কার্জনের বিশেষ নজর ছিল, তাই বাংলা দেশেই আন্দোলন প্রবলতর রূপ নেয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় তখন বাংলা দেশেই রাজনৈতিক চেতনা সবচেয়ে বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙ্গালী হিন্দুই ভারতীয় রাজনৈতিক জাগরণের অগ্রদূত। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন ঠিক করলেন যে বাংলা দেশকে বিভক্ত করবেন। তাঁর ধারণা ছিল যে বিভাগের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কায়েমী মনকষাকষি দেখা দেবে।

বাংলা দেশ লর্ড কার্জনের এ হুকুম বরদাস্ত করেনি। তাঁর আদেশের প্রতিক্রিয়ায় যে রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা বাংলা দেশে দেখা দিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। তিনি "কর্মযোগীন" বলে যে পত্রিকা প্রকাশিত করেন, তা জাতীয় জাগরণ ও বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

এই সময়েই আমার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংগে পরিচয় হয়। তখনকার দিনে তিনি বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। আমার মনে আছে যে সে সময়ে অরবিন্দ ঘোষের সংগেও আমার দু তিনবার সাক্ষাৎ হয়। বৈপ্লবিক কর্মপন্থা যে কত বিপদজনক, সে বিষয়ে আমার কোন মোহ ছিল না, কিন্তু সব জেনে শুনেও আমি

বৈপ্লবিক রাজনীতিতে আকৃষ্ট হই এবং এক বৈপ্লবিক দলে যোগ দিই।

তখনকার দিনে এসব বিপ্লবী দলে যারা যোগ দিয়েছিল, তারা সবাই বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। শুধু তাই নয়, বিপ্লবী দলগুলি সক্রিয়ভাবে মুসলীম-বিরোধীও ছিল। মুসলীম সমাজের প্রতি তাদের বিরোগের প্রধান কারণ যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে মুসলমান সমাজকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করত এবং অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানেরা ইংরাজের স্বার্থ রক্ষায় নিজেদের এবং দেশের ক্ষতি করেছে। এই মতলবেই পূর্ব বঙ্গে আলাদা প্রদেশ স্থাপিত হয়। পূর্ব বঙ্গের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার তো খোলাখুলিই বলতেন যে মুসলমান সমাজ ইংরেজ রাজের সুয়োরানী। বিপ্লবীরা তাই মনে করত যে মুসলমান সমাজ ভারতীয় স্বাধীনতার পথে এক অন্তরায়। তাই তারা স্থির করেছিল যে অন্যান্য বাধার মত এ বাধাকেও দূর করতে হবে।

বিপ্লবীরা যে মুসলমান সমাজকে বিরাগের চোখে দেখত তার আরও একটি কারণ ছিল। তখনকার দিনের সরকার মনে করত যে বাঙ্গালী হিন্দুর রাজনৈতিক চেতনা এত বেশী যে বিপ্লবীদের দমন করবার কাজে কোন বাঙ্গালী হিন্দু কর্মচারীকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে না। তাই সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদে সরকার যুক্তপ্রদেশ থেকে কয়েকজন মুসলমান কর্মচারীর আমদানী করে। তার ফলে বাঙ্গালী হিন্দু ভাবতে শুরু করল যে মুসলমান মাত্রই রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী এবং হিন্দু সমাজের শত্রু।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যখন তাঁর বিপ্লবী অন্যান্য বন্ধুদের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে আমি বিপ্লবী দলে যোগদান করতে চাই, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হন। প্রথম প্রথম তাঁরা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি, তাঁদের গোপন মন্ত্রণায় আমাকে স্থানও দেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং তখন প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই আমার পরামর্শ নিতে শুরু করেন। তাঁদের সংগে আমার বহু বিতর্ক হয় এবং আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে মুসলমান সমাজকে শত্রু মনে করা মস্ত বড় ভুল। তাঁদের আমি বলি যে বাংলা সরকারের ২০/৩০টি মুসলমান কর্মচারীর ক্রিয়াকলাপ দেখে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে ধারণা করা উচিত হবে না। মিশরে, পারস্যে এবং তুর্কী দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য বহু মুসলমান বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করতে এগিয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের মুসলমানও যেদিন বুঝবে যে দেশের স্বাধীনতার মধ্যেই তাদেরও কল্যাণ, সেদিন তারাও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। আমার বিপ্লবী বন্ধুদের আমি একথাও বোঝাতে চাইলাম যে মুসলমান সমাজ নিরপেক্ষ থাকলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হবে। তারা সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই আদর্শবাদ এবং লক্ষ্য সিদ্ধির উপায়, এই দুই বিচারেই মুসলমান সমাজের বন্ধুত্ব ও সহায়তা অর্জন করা প্রয়োজন।

আমার বিপ্লবী বন্ধুরা প্রথমে আমার এ বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু অনেক আলাপ আলোচনার পরে তাঁদের মধ্যে অনেকে আমার সংগে একমত হন। আমিও ইত্যবসরে মুসলমান সমাজে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই দেখলাম যে নতুন রাজনৈতিক মত ও পথ অবলম্বন করবার জন্য একদল মুসলমান যুবক তৈরী রয়েছে।

আমি যখন বিপ্লবী দলে প্রথম যোগদান করি, তখন তাদের কার্যকলাপ সেকালের বঙ্গদেশে (অর্থাৎ বর্তমান বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে) সীমাবদ্ধ ছিল। আমার সহকর্মীদের আমি বললাম যে আমাদের কর্মক্ষেত্রের প্রসার বাড়াতে হবে। একথাও তাঁরা প্রথমে মানতে চাননি, বলেছেন যে গুপ্তকার্যক্রমকে বেশী ছড়াতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে। অন্যান্য প্রদেশে যদি বিপ্লবী দলের শাখা স্থাপিত হয়, তখন কার্যক্রমকে আর গোপন রাখা চলবে না। শেষে কিন্তু তাঁরা আমার কথায় সায় দেন এবং আমি দলে যোগ দেওয়ার দু'ই বছরের মধ্যেই উত্তর ভারত এবং বোম্বাইয়ের বড় বড় অনেক সহরে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। যেভাবে আমাদের সমিতিগুলির স্থাপনা হয় সে সম্বন্ধে অনেক গল্প মনে আসছে। সে সব কাহিনী চিত্তাকর্ষক, এবং তাতে হাস্যরসের উপাদানও মিলবে, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তাদের আলোচনার স্থান নাই। আত্মকথার প্রথম খণ্ডে এ সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

৪

এই সময়ে আমি ভারতবর্ষের বাইরে সফরে যাই এবং ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুর্কী দেশে ভ্রমণ করি। এ সমস্ত দেশে ফরাসী ভাষার খুব আদর ছিল। ফরাসীর প্রতি আমিও আকৃষ্ট হই কিন্তু শীঘ্রই দেখলাম ইংরাজী পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং ইংরাজীর মাধ্যমেই আমার সমস্ত কাজ চালাতে পারব।

মহাদেব দেশাই আমার শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার সংশোধন করতে চাই। তিনি যখন আমার জীবনী লেখেন, তখন অনেকগুলি প্রশ্ন লিখে আমাকে পাঠান। একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে আমার বয়স যখন আন্দাজ কুড়ি, তখন আমি মধ্য প্রাচ্যের সফরে গিয়েছিলাম এবং বহুদিন মিশরে কাটাই। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে তখনকার প্রাচ্য শিক্ষা পদ্ধতির নানা গলদ ছিল। কেবল ভারতবর্ষেই নয়, কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষাপদ্ধতি নিষ্ক্রিয় ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। মহাদেব দেশাই প্রশ্ন দু'টি গুলিয়ে ফেলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আমি আল আজহারে শিক্ষালাভের জন্যই মিশরে গিয়েছিলাম। আসলে কিন্তু আমি আল আজহারে একদিনও ছাত্র হিসেবে কাটাইনি, অন্য মুসাফিরের মত আমিও কেবল বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম। মহাদেব দেশাই-এর হয়ত ধারণা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না করলে কেউ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে না। তিনি যখন শুনলেন যে ভারতবর্ষে আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িনি, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে আমি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লাভ করেছি।

আমি যখন ১৯০৮ সালে কায়রো যাই, তখন আল আজহারের শিক্ষা পদ্ধতি এত খারাপ ছিল যে তাতে মানসিক বিকাশ তো হতই না, এমনকি প্রাচীন বিখ্যাত আরবী শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হত না। শেখ মহম্মদ আবদু আল আজহারের শিক্ষা সংস্কারের অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মৌলবী ও মোল্লাদের বাধার ফলে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি যখন দেখলেন যে আল আজহারের উন্নতি করবার কোন আশাই নাই, তখন দারুল উলুম নাম দিয়ে এক নতুন শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। আজও কায়রো সহরে তা কায়েম রয়েছে। আল আজহারে যখন শিক্ষার এই

দুর্গতি, তখন সেখানে শিক্ষালাভের জন্য ভারতবর্ষ থেকে কেন যাব, এ কথাটি মহাদেব দেশাই একবারও ভেবে দেখেননি।

মিশর থেকে আমি ফরাসী দেশে যাই এবং ইচ্ছা ছিল যে লণ্ডনেও যাব, কিন্তু তা হয়ে উঠল না। প্যারিসে থাকতেই খবর পেলাম যে আমার পিতা অসুস্থ। তাই দেশে ফিরে এলাম, লণ্ডন তখন আর দেখা হল না। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজনৈতিক সংগ্রামে কাটল, তার পরে ১৯৫১ সালে প্রথম লণ্ডন দেখবার সুযোগ পাই।

আগেই বলেছি যে ১৯০৮ সালে কলকাতা থেকে বেরোবার আগেই বৈপ্লবিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির দিকে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ইরাকে পৌঁছে ইরানের বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মিশরে মুস্তাফা কামিল পাশার সহকর্মী ও শিষ্যদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নবীন তুরস্ক আন্দোলনে তখন তুরস্কে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। একদল তুর্কী যুবক কায়রোতে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করত। তাদের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়। পরে যখন তুরস্কে যাই, তখন নবীন তুরস্ক আন্দোলনের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে পত্রালাপ বজায় রেখেছিলাম।

এই সমস্ত আরব ও তুরস্ক বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে আমার রাজনৈতিক মতবাদ ও বিশ্বাস আরও পাকা হয়ে উঠল। তাঁদের কাছে আশ্চর্য লাগত যে ভারতবর্ষের মুসলমান জাতীয় দাবীর ব্যাপারে কেন এভাবে বীতরাগ অথবা বিরূপ। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে মুসলমানদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভারতীয় মুসলমান যে ইংরাজ সরকারের তাঁবেদার হতে পারে, একথা তাঁরা বুঝতেই পারতেন না। আগেই আমার ধারণা হয়েছিল যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়া ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য। এখন সে ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। আমি স্থির করলাম যে বৃটিশ সরকার যাতে মুসলমান সমাজকে তাদের হাতের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমি স্থির করলাম যে দেশে ফিরে আরও ঐকান্তিকভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করব।

দেশে ফেরবার পরে কিছুদিন ধরে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধে অনেক ভাবলাম। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে জনমত নতুন করে গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য নতুন সংবাদপত্রের প্রয়োজন। তখনকার দিনে পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে কয়েকখানি উর্দু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, কিন্তু তাদের সবগুলির মধ্যেই উৎকর্ষের অভাব ছিল। কেবল ছাপা ও বাঁধাই বলেই নয় লেখাগুলিও খুব উঁচু দরের ছিল না। লিখো করে ছাপা হত বলে আধুনিক সংবাদপত্রের অনেক অঙ্গ অপূর্ণ থেকে যেত। এমনকি হাফটোন ছবিও এসব পত্রিকায় ছাপা যেত না। আমি স্থির করলাম যে আমি যে পত্রিকা প্রকাশ করব তার আবেদন যেমন প্রবল হবে, ছাপা ও বাঁধাইও তেমন মনোহারী হবে। তাই ঠিক করলাম যে লিথোর ব্যবহার না করে পত্রিকা প্রেসে ছাপবার ব্যবস্থা করব। এমনি ভাবে আলহিলাল প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আলহিলাল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৯১২ সালে জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের উর্দু সংবাদপত্রের ইতিহাসে আলহিলাল এক নব যুগের প্রবর্তন করে। অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ছাপা ও বাঁধাইয়ের

উৎকর্ষ লোককে আকৃষ্ট করে ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আকৃষ্ট করে পত্রিকাখানির প্রবল জাতীয় মনোভাব। জনসাধারণের মধ্যে আলহিলাল এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। আলহিলালের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে প্রথম তিন মাসের মধ্যেই পুরানো সংখ্যাগুলিকে বারবার পুনর্মুদ্রিত করতে হয়। প্রত্যেক নতুন গ্রাহকেরই দাবী ছিল যে প্রথম সংখ্যা থেকেই আলহিলালের পুরো সেট দিতে হবে।

মুসলীম রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই সময় আলিগড় পার্টির হাতে ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে স্যর সৈয়দ আহমদের রাজনীতির তাঁরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁদের মৌলিক নীতি ছিল যে বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তির ভিত্তিতেই মুসলীম রাজনীতি গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় মুসলমান স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন যোগদান না করে, সে বিষয়ে তাঁদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। আলহিলাল যখন নতুন রাজনৈতিক বাণী ঘোষণা করল এবং দিন দিন তার প্রচার ও জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল তখন তাঁদের ভয় হল যে তাঁদের নেতৃত্ব বুঝি টিকবে না। তাঁরা তখন সর্বপ্রকারে আলহিলালের বিরোধিতা শুরু করেন। এমন কথাও বলা হয়েছিল যে দরকার হলে আলহিলাল সম্পাদককে হত্যা করা হবে। ফল কিন্তু ঠিক বিপরীত হল। পুরাতন নেতৃত্বের বিরোধিতা যতই বাড়তে লাগল, মুসলমান সমাজে আলহিলালের জনপ্রিয়তাও ততই দ্রুত বাড়তে লাগল। দুই বছরের মধ্যেই আলহিলালের প্রচার সপ্তাহে ২৬০০০ হয়ে দাঁড়াল। উর্দু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এরকম প্রচার তখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

আলহিলালের এই সফলতায় সরকারও বিচলিত হয়ে উঠল। আলহিলালকে সায়েস্তা করবার জন্য প্রথমে তাই প্রেস আইন অনুসারে দুই হাজার টাকার জামানত দাবী করা হয়। সরকার হয়তো ভেবেছিল যে টাকার ভয়ে আলহিলালের মতবাদ খানিকটা নরম হবে। এ সমস্ত বাধা নিষেধ কিন্তু আমার মনে কোন দাগ কাটেনি। অল্পদিনের মধ্যেই তাই সরকার পূর্ব জামানত বাজেয়াপ্ত করে আরও দশ হাজার টাকার জামানত দাবী করল। এ জামানতও বেশী দিন টিকল না। ১৯১৪ সালে লড়াই শুরু হয়েছিল, ১৯১৫ সালে সরকার আলহিলাল প্রেস বাজেয়াপ্ত করে নিল। পাঁচ মাস পরে আমি আলবালাগ নাম দিয়ে নতুন প্রেস প্রতিষ্ঠা করলাম এবং সেই নামেই নতুন পত্রিকা প্রকাশ করি। গভর্ণমেণ্ট তখন বুঝতে পারল যে কেবল প্রেস আইন দিয়ে আমাকে দমাতে পারবে না। তাই এপ্রিল ১৯১৬ সালে ভারত রক্ষা আইনে আমাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃমণের হুকুম দেওয়া হয়। পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ এবং বোম্বাই সরকার এই একই আইনে সে সমস্ত প্রদেশে আমার প্রবেশের অধিকার রোধ করেছিল। উত্তর ভারতে খালি বাকি রইল বিহার। তাই আমি রাঁচী চলে গেলাম। ছয় মাস পরে রাঁচীতে আমাকে অন্তরীণ করা হয় এবং ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি সেখানে আটক ছিলাম। ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারীর রাজ-ঘোষণা অনুসারে অন্যান্য অন্তরীণ এবং বন্দীদের সঙ্গে আমিও মুক্তিলাভ করি।

৫

ততদিনে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছে। আমি যখন রাঁচীতে অন্তরীণ ছিলাম, তিনি চম্পারণে কিষাণ আন্দোলনের কাজের উপলক্ষে রাঁচী আসেন। আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু বিহার সরকার অনুমতি দেয় নি। তাই

মুক্তির পরে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লী সহরে আমি প্রথম গান্ধীজীর সাক্ষাৎলাভ করি। তখন খিলাফত এবং তুরস্কের ভবিষ্যত নিয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজে প্রবল আলোড়ন চলছিল। প্রস্তাব করা হয় যে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জানাবার জন্য বড়লাটের কাছে এক ডেপুটেশন পাঠানো হোক। গান্ধীজী এসব আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে তিনি প্রস্তুত। ২০শে জানুয়ারী দিল্লীতে এক মিটিং হয়, এবং গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মনোভাবের সমর্থন করেন।

ডেপুটেশন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে। আমি মেমোরিয়াল সই করেছিলাম কিন্তু ডেপুটেশনের মেম্বার হতে স্বীকার করিনি। আমার মতে মামলা যেখানে পৌঁছেছিল, তাতে ডেপুটেশন বা মেমোরিয়াল দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হবে না। বড়লাট ডেপুটেশনের কথা-বার্তা শুনে বললেন যে বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাতে চাইলে তিনি সাহায্য করবেন। ডেপুটেশন বৃটিশ সরকারের কাছে সব কথা বলতে পারবে কিন্তু তিনি নিজে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।

এ অবস্থায় কি করণীয় তা নিয়ে অনেক বিচার হল। মিস্টার মহম্মদ আলি, মিস্টার শওকত আলি, হাকিম আজমল খাঁ এবং লক্ষ্ণৌ-এর মৌলবী আবদুল বারীকে নিয়ে আমাদের এক ঘরোয়া মিটিং হয়। গান্ধীজী সেখানে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা পেশ করেন। তিনি বলেন যে ডেপুটেশন বা মেমোরিয়ালের দিন চলে গেছে। গভর্ণমেণ্টকে আমাদের কথা মানাতে হলে সরকারী সমস্ত ব্যাপার থেকে সরে আসতে হবে। তিনি বললেন যে সমস্ত সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দিতে হবে, আইন আদালত এবং স্কুল কলেজ বয়কট করতে হবে, সরকারি চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে হবে। নতুন যে আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত করবার কথা হচ্ছিল, তাতেও যোগদান করা চলবে না।

গান্ধীজীর প্রস্তাব শুনেই আমার মনে পড়ল যে বহুদিন আগে টলস্টয় এই ধরনের প্রোগ্রামের খসড়া প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। ১৯০১ সালে একজন নৈরাজ্যবাদী ইতালীর রাজাকে আক্রমণ করে। টলস্টয় তখন পৃথিবীর সমস্ত নৈরাজ্যবাদীদের উদ্দেশে এক খোলা চিঠি লেখেন। তিনি বলেন যে হিংসার পথ বর্জন করতে হবে, কারণ তাতে নীতির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় অথচ রাজনৈতিক কোন লাভ হয় না। একজন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার স্থান আর একজন ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তাতে সরকারের কাজে ব্যাঘাত হবে না। বস্তুতপক্ষে হিংসার পথে চললে তাতে খালি হিংসার পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু কোন স্থায়ী ফল মেলে না। গ্রীক প্রবাদ অনুসারে একজন যোদ্ধাকে হত্যা করলে তার রক্ত বিন্দু থেকে ৯৯৯ জন যোদ্ধার সৃষ্টি হয়, রাজনৈতিক হত্যার ফলে রক্তবীজের বংশ বেড়েই চলে। টলস্টয় তাই নৈরাজ্যবাদীদের এই উপদেশ দিলেন যে অত্যাচারী শাসনতন্ত্রকে অচল করতে হলে অহিংস উপায় অবলম্বন করতে হবে। দেশের লোক যদি খাজনা বন্ধ করে, সরকারি চাকরী থেকে ইস্তফা দেয় এবং সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করে, তবে প্রবল পরাক্রান্ত সরকারকেও পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আমার মনে পড়ল যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ কর্মপন্থা সমর্থন করে আমি আলহিলালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

সভায় অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতবাদ ও মনোভাব অনুসারে উত্তর দিলেন। হাকিম আজমল খাঁ বললেন যে ভালভাবে বিবেচনা না করে তিনি কিছু

বলতে চান না। নিজে কর্মপন্থা পুরোপুরি ভাবে স্বীকার করবার আগে অন্যকে উপদেশ দেওয়া তাঁর মতে ঠিক হবে না। মৌলবী আবদুল বারী বললেন যে গান্ধীজীর প্রস্তাব কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন করেছে। এ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে তিনি ভগবত নির্দেশ চাইবেন, তার পূর্বে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। মিঃ মহম্মদ আলি ও মিঃ শওকত আলি বললেন যে মৌলবী আবদুল বারীর সিদ্ধান্ত না শুনে তাঁরা কিছু বলবেন না। গান্ধীজী তখন আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বিনা দ্বিধায় বললাম যে তাঁর কর্ম-পন্থাই পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। ভারতীয় মুসলমান যদি তুরস্ককে সাহায্য করতে চায়, তবে গান্ধীজীর কর্মপন্থাই ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই।

কয়েক সপ্তাহ পরে মীরাটে এক খিলাফৎ কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় এই সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষিত হয়। গান্ধীজীর পরে আমি বক্তৃতা করি এবং তাঁর প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজীর কর্মসূচী আলোচনার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। গান্ধীজী বলেন যে স্বরাজ এবং খিলাফৎ এই উভয় লক্ষ্যের জন্যই অসহযোগ আন্দোলন প্রয়োজন। লালা লাজপত রায় তখন কংগ্রেসের সভাপতি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁরা কেউই গান্ধীজীকে সমর্থন করেননি। বিপিনচন্দ্র পাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং বলেন যে বিদেশী বর্জনের মধ্য দিয়েই বৃটিশ সরকারকে পরাজিত করা চলবে। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিরাট সংখ্যাধিক্যে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশকে তৈরী করবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সমস্ত দেশে সফর শুরু করলেন। আমি প্রায় সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে যেতাম। মহম্মদ আলি এবং শওকত আলিও বহু জায়গায় আমাদের সঙ্গে গিয়েছেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ততদিনে দেশের মেজাজ একেবারে বদলে গেছে। নাগপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন খোলাখুলি ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন করেন। লালা লাজপত রায় প্রথমে বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু যখন দেখলেন যে পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা সকলেই গান্ধীজীর অনুগামী তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

দেশের বিভিন্ন নেতাদের বন্দী করে সরকার অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করতে চেষ্টা করল। বাংলা দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আমি প্রথমেই গ্রেপ্তার হই। সুভাষচন্দ্র বোস এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও জেলখানায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়, ফলে ওয়ার্ডটি রাজনৈতিক আলোচনার এক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে সরকার ছ'মাসের জন্য জেল দেয়। আমার বেলায় বিচার বহুদিন ধরে চলে ও শেষে আমাকে এক বৎসরের জন্য জেলে আটক করে রাখার হুকুম হয়। ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত আমি জেল থেকে ছাড়া পাইনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্বেই ছাড়া পেয়েছিলেন ও কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। অধিবেশনে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে গভীর মতবিরোধ দেখা দেয়। চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল খাঁ স্বরাজ পার্টী নামে একটি দল গঠন করেন ও কাউন্সিলে যোগ দেবার পক্ষে মত দেন। গান্ধীজীর অনুগামীরা দেশবন্ধু দাসের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস নো

চেঞ্জার্স ও প্রো চেঞ্জার্স এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আমি জেল থেকে বেরিয়ে এই দুই দলের মধ্যে আপোষ করবার চেষ্টা করি এবং ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের স্পেশাল সেসনে আমার চেষ্টা সফল হয়। আমাকে এই সেসনের সভাপতি হতে অনুরোধ করা হয়। আমার বয়স তখন ৩৫ বৎসর। বলা হয় যে আমার চেয়ে কম বয়সে কেউ কোনদিন কংগ্রেসের সভাপতি হননি।

১৯২৩ সালের পর থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টীর হাতে চলে যায়। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আইন সভাতেই স্বরাজ পার্টী অধিক সংখ্যক স্থান অধিকার করে। কেন্দ্র এবং প্রদেশের আইনসভার সমস্ত কাজেই তাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কংগ্রেসের যাঁরা স্বরাজ পার্টীতে যোগ দেননি, তাঁরা দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁরা জনসাধারণের বিশেষ সাহায্য পাননি, জনতার হৃদয় আকর্ষণ করতেও পারেননি। দেশের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সেদিন স্বরাজ পার্টীই পেয়েছিল। তখন যে সব ঘটনা ভারতের ভবিষ্যত রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে তার বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে, আমার জীবনীর প্রথম খণ্ডে তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেব।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন যখন ভারতে আসে, তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা আবার খুব বেড়ে যায়। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে ও বৃটিশ সরকারকে এক বছরের নোটিস দেয় যে যদি দেশের দাবী তার মধ্যে পূরণ করা না হয়, তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হবে। বৃটিশ সরকার আমাদের দাবী অমান্য করে এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেস লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করে। প্রথম প্রথম অনেকেই লবণ সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি সরকারও প্রথমে খানিকটা ব্যঙ্গের চোখে ব্যাপারটি দেখেছে, কিন্তু সত্যাগ্রহ যখন খুব জোরে চলল, তখন জনসাধারণ ও সরকার সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়। সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষণা করল এবং কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দিল। সরকারকে জব্দ করবার জন্য আমরাও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম। প্রত্যেক সভাপতিকে তাঁর গ্রেপ্তারের সঙ্গে তাঁর স্থলে অন্য লোককে মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়। আমাকেও সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল। আমি আমার ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মনোনীত করলাম এবং গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই ডাঃ আনসারীকে আমার স্থানে মনোনীত করলাম। প্রথমে তিনি আন্দোলনে যোগ দিতে চাননি কিন্তু পরে আমি তাঁকে রাজী করাই। এইভাবে আমরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে পেরেছিলাম, আন্দোলনও প্রবল ভাবে জারী রইল।

মীরাটে বক্তৃতা করার অপরাধে আমি গ্রেপ্তার হই। সেখানকার জেলে আমাকে প্রায় দেড় বৎসর আটক রাখা হয়।

এক বৎসর আন্দোলন চলবার পরে লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের জেল থেকে মুক্তি দেন। প্রথমে এলাহাবাদে ও পরে দিল্লীতে আমাদের মিটিং হয়। এই সময় গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট হয়ে বন্দী কংগ্রেসীদের ছেড়ে দেওয়া হল। রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য কংগ্রেস আমন্ত্রিত হয়, কিন্তু কনফারেন্সে কোন ফল হয় না ও গান্ধীজী খালি হাতে ফিরে আসেন। লণ্ডন থেকে ফেরবার পরেই গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় ও সরকার দেশব্যাপী দমননীতি চালু করে। সে সময় লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট ছিলেন। তিনি কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

এই সময় আমি দিল্লী জেলে এক বৎসরের উপর বন্দী ছিলাম। সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণও আমার জীবনীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

১৯৩৫ সালে ভারত সরকার নতুন আইন পাশ করে। ফলে দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হল। কেন্দ্রীয় সরকারে ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের নীতিও স্বীকৃত হল। এইখানেই আমার জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু।

[ক্রমশঃ]

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। বিনা অনুমতিতে পূর্ণত বা অংশত পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ]

কবিতা

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে

অরুণ মিত্র

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে। ভালোবাসার ছাঁচে গড়া তার মুখটা তখন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। না হলেও এইটুকু আন্দাজ করা যায় সেখানে যত ব্যাকুলতা ছিল তা সে মুছে ফেলে দিয়েছে। ফতুর হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো সে মন্থর ক'রে উত্তর দেবে, যেন এক নিষ্ঠুর রহস্যের উদ্ঘাটন করছে। তার গলা শুনলে মনে হবে জীবনের অন্য এক পার থেকে সে কথা বলছে। সে বলবে : দুপুরের আগুন তার পাঁজরায় লেগেছিল, তার পায়ের তলা থেকে নদীচরের বালি স'রে স'রে গিয়েছিল আর তারই হাতের নীচে ফসলের চারাগুলো অবশেষে এলিয়ে পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পর সে চ'লে এসেছে এবং যে অটুট শীতলতা তাকে সম্পূর্ণ জুড়িয়ে দিতে পারে তাই চেয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে আছে। এ-সব কথা যতই অবাস্তব শোনাক, তার নিজের কাছে এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই।

তাকে ঘিরে জোনাকির ঝাঁক উড়তে আরম্ভ করে। তার মুখটা তখন আবছা এক তোড়ার মতো দেখায়। কিন্তু মনে হয় খুব আলগোছে ছুঁলেও তা ঝ'রে পড়বে, ঝ'রে প'ড়ে ধুতরো আর আশশ্যাওড়ার ঝাড়ের ভিতর হারিয়ে যাবে।

সেই বুড়োটে লোকটার জন্যে

হরপ্রসাদ মিত্র

নীলশার্টে তালি বুড়োটে লোকটা কাশছে আমারই রাস্তায়,
অঘ্রানে রোদ উঁচু ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়েছে ঢালুতে,
কতো লোক চলে ত্রস্ত, ব্যস্ত—কতো অনন্ত ধান্দায়—
রিক্সাটা আর ট্রামটা দাঁড়িয়ে—
এবং বাতাসে অঘ্রান।
এবং হঠাৎ মনে পড়লো যে কাছেই ফুটেছে পদ্ম—
মজা বাংলায় সোনামুখী, আর বরশুল, আর ফুলিয়া॥

নিজেকে জানার, নিজেকে চেনার অথির-বিথার সৌরভ—
যেন আলো কোনো গম্বুজ থেকে গড়িয়ে পড়ছে তীর্থে;
বেদনা তোমার মজ্জায় প্রেম! ব্যাকুলতা আর কান্না!

নীলশার্টে তালি বুড়োটে লোকটা ত্রস্ত, ক্লান্ত, জীর্ণ—
কারণ, সে তার রাস্তা হেঁটেছে,—হেঁটে, হেঁটে, হেঁটে জীর্ণ।
কারণ, অনেক অভ্যাসে আর মূর্চ্ছাতে প্রাণনাট্য—
ছেঁড়া কাগজের ধূসর গদ্য গোধূলি-আলোর পাঠ্য॥

মেয়েরা বুনছে মাদুর, তবুতো, ছেলেরা বানায় রাস্তা,
বীজ বুনে দেয়, মাটিতে ছড়ায় নতুন শস্য-সংবাদ—
চায় সমবায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনের মাধুরী—অর্থাৎ
নীলশার্টে তালি বুড়োটে লোকটা মরবেই, জানি মরবেই॥
বিশ্বাসে যদি ঘুন ধরে, আর প্রেমে ধিক্কার,—স্বপ্নেও,
শেষ ধ্রুবপদ গাইবে প্রকৃতি গুন্-গুন্-গুন্ শান্তি!

বিপ্রলব্ধ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

তুমি এক দূরের বাতাস
যেখানে আরেক আলো অন্ধকারে ফেলে তার শ্বাস
অন্য ভোর-গন্ধে ভরা, যার
অনুভব স্বপ্ন হয়ে থাকে।
পৃথিবীর স্বচ্ছ কোনো নির্যাসে তোমাকে
দেখে থাকবো-ও বা,
ছায়া নয়, যেন ম্লান শোভা
সব ছুঁয়ে কাঁপে
তারপর পরিচিত অন্ধকারে ডোবে অভিশাপে।

॥ দুই ॥

সেই দূরে সে-আলোয় আমার যে ছবি
ঘুমোয় অঘোরে,
কিম্বা জাগে, শোনে মুগ্ধ তোমার ভৈরবী
অফুরন্ত ভোরে,
তাকে ভুলে যেতে পথে শ্রমজলে সমস্ত দুপুর
শুনি আমি দিন-ভাঙা সুর।

॥ তিন ॥

তবু যদি তাকে মনে পড়ে নীল বাতাস-দোলায়
সাধ্য নেই এ-পথের অকরুণ প্রবাস ভোলায়॥

মাতিস, রঙ, নৈরাজ্য

অশোক মিত্র

কয়েকমাস আগে লণ্ডনে এক শিল্পীর কথা শোনা গিয়েছিলো, যিনি মেঝেতে ক্যানভাস বিছিয়ে নেন, বিভিন্ন রঙ ও ছাপাখানার কালি ঢালেন, খেয়াল খুশিমতো তারপর ক্যানভাসের উপর কখনো হেঁটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে বেড়ান। রঙ ও কালি শুকিয়ে এলে প্যারাফিনে ডুবিয়ে রাখেন, কয়েকদিন বাদে তুলে এনে ফের ঝিরঝিরে বালিতে ডুবোন, উদ্দেশ্য : রঙে ঘনতা আসবে।

এটা অবশ্য বিচ্ছিন্ন-কোনো উৎকেন্দ্রিকের কাহিনী নয়। পুরোনো কতগুলো শব্দ স্থির প্রত্যয়ে ইওরোপের শিল্পীমণ্ডলে ফিরে আসছে; দাদা, কভ প্রভৃতি আপাত-প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরূপ যেন এতদিনের ব্যবধানে তন্নিষ্ঠ উত্তরাধিকারে অবরোহণরত। তিনটি আখ্যা পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে : action painting, tachism, abstract expressionism। প্যারিসে জর্জ ম্যাথিয়ুকে কেন্দ্র ক'রে এই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান সঞ্চালন, কিন্তু লণ্ডনেও action-শিল্পের ঢেউ ছুঁয়েছে, এবং আটলাণ্টিক পেরিয়ে নিউ ইয়র্কে। এঁদের শিল্পভাষণের সারাংশ মোটামুটি এরকম : শুধু তাৎক্ষণিক ক্রিয়াকল্পের প্রতিবিম্ব ফোটানো ছাড়া শিল্পের অন্য-কোনো ব্রত নেই। প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম বিচ্ছিন্ন, এবং দার্শনিক সমগ্রতার স্পর্শবিহীন। দর্শন যখন নেই, শিল্পের একমাত্র সংস্থান তাহ'লে ক্ষণধর্মে। চিন্তা নয়, অনুভাবনা নয়, ইতিহাস নয়, শিল্প শেষবিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংবদ্ধ প্রস্থান। যে-ছবি আঁকা হচ্ছে, তার একক লক্ষ্য হ'লো কেমন-করে-আঁকা-হ'লো তন্মুহূর্তের ইতিবৃত্তটিকে নিখুঁত ক'রে ফুটিয়ে তোলা। এ শুধু লাল নীল কিংবা শফেদ ঘোড়াকা সওয়ারের কাহিনী : ছবি তাহ'লে সে-অশ্বের কথাই বলুক, তার হ্রেষা, তার পদক্ষেপ, তার খরোধরো উদ্দামতা; সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলুক অশ্বারোহীর হৃদয়ের-চেতনার চকিত-ক্ষচিত স্পন্দন।

মোট কথা, শিল্পের অন্য-কোনো লক্ষ্য যেহেতু নেই, তাকে উত্তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে হবে, তাকে হ'তে হবে ঝঞ্জার ঝঞ্জনা। অতএব পারস্পরিক সৌষম্যের কথা ভুলে গিয়ে, এলোমেলো বিন্যাসে, বেপরোয়া রঙ ঢালা হোক—তারপর চলুক উপরি-উল্লিখিত আপাত অনাচারের অভিনয়। শিল্প এবং কুরুক্ষেত্র একাকার হয়ে যাক।

বলা বাহুল্য, ব্যাকরণিক অনুশাসন মেনে নিলে ইত্যাকার ছবি অবোধ্য, বিদ্রোহ ছাড়া তাদের অন্য-কোনো প্রসঙ্গ নেই, ইঙ্গিত নেই। এই শিল্প-আন্দোলনের অবশ্য অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যাও সম্ভব। যা প্রাথমিক বিচারে নৈরাজ্য, তাকেই পরিশীলিত ভাষায় বলা চলে একাকিত্বের নির্ঘোষ, অনুসত্তার স্পর্ধিত আত্মপ্রতিষ্ঠা।

Abstract Expressionism হয় তো টিঁকবে, বাড়বে, নয় তো দুয়েকবছরের মধ্যে, অভিনবত্বের সেতু উত্তীর্ণ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে যাবে। অধিকতর যা সম্ভবপর, ফভ কিংবা দাদা-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিলো, এ-শিল্পশৈলী থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্র কোনো নবসংশ্লেষণ জন্ম নেবে। জর্জ ম্যাথিয়ু ও তাঁর অনুকারীদের শিল্প তখন আর চমকিত চিটিক্কার উদ্রেক করবে না, ঐতিহ্যের প্রধান প্রবাহে

গৃহীত হবে।

ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য actionist-সম্প্রদায়েরও যে সন্তর্পিত আগ্রহ আছে, দলপতিদের কারো-কারো মাতিসের উত্তরাধিকার দাবি করা থেকেই তা বোঝা যায়। এঁরা বলেন, রঙ নিয়ে মাতিসের নিরীক্ষা যে-প্রান্তর পর্যন্ত এগিয়েছিলো, তাঁদের যাত্রা সেখান থেকে শুরু। আধারকে পাশে সরিয়ে রেখে মাতিস রঙকে সম্রাটের আসনে অভিষিক্ত ক'রে গিয়েছিলেন। হালের অভিনব-সম্প্রদায় বলছেন, তাঁরা আরো-একটু অগ্রসর হয়েছেন মাত্র। মাতিসের ছবিতে যেমন দর্শনচিন্তা-ইতিহাস উহ্য, তাঁদের শিল্পেও তাই, তাঁদের অভিক্ষেপেও বর্ণসংস্থাপনই প্রধান। শুধু, মাতিস শেষ পর্যন্ত সুষমাতে আস্থা রেখে গেছেন, অন্যপক্ষে action-গোষ্ঠী সংবন্ধতা দৃঢ়চিত্তে বিসর্জন দিয়েছেন।

এই দাবি কি উন্মাদের চীৎকার, না কি মাতিস থেকেই বর্তমান নৈরাজ্যের স্ফুরণ? মাতিস-অনুরাগীদের পক্ষে কথাটা ভেবে দেখবার মতো। প্রথমেই অবশ্য বলা চলে, abstract expressionist-দের চিত্রাবলীতে আবেগ যদিও পুঞ্জিত হয়ে আছে, সে-আবেগে আনন্দ নির্বাপিত। Action-প্রক্রিয়ায় হিংসা, দ্বেষ, অস্থিরতা, নৈরাশ্য ইত্যাদি অনেক অনুভূতিই হয়তো ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু আনন্দদ্যোতনার চেষ্টায় এ-পন্থাত পরাহত। ম্যাথিয়ু, পোলক, দ্য কোনিং, ক্লাইন : এঁদের শিল্পকর্ম আনন্দের বহুদূর বাইরে।

অথচ মাতিসের শিল্পলোক, বলতেই হয়, 'আনন্দ, আনন্দ শুধু, আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ'। এমনকি সমসাময়িকদের থেকেও এখানেই তাঁর অনাচারিতা। গত শতকের শেষের দিকে, এবং এ-শতকের গোড়ায়, ফরাসি শিল্পাবহে যে-বিষাদাচ্ছন্ন ঘোর—যার স্পষ্ট আভাস পিকাসোর রু-পিরিয়ডে, কিংবা উত্রিয়োর সারি-সারি ফ্যাকাশে-শাদা দেয়ালে-ঘর-বাড়িতে, তা থেকে মাতিস যেন ছিটকে-বেরোনো। আনন্দ-ও উপভোগে-পরিকীর্ণ এক পৃথিবী। যদি মাত্র একটি বিশেষণে মাতিসের সমগ্র শিল্পকর্মের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়, তাহ'লে বলতে হয় : মনোমোহিনী। চিন্তায় উৎপীড়িত, ব্যর্থতায়-নুয়ে-পড়া মানুষ তাঁর কোনো ছবির দিকে যেই সামান্য-একটু চোখ তুলে তাকাবে, শান্তির প্রলেপ তন্মুহূর্তে শিশিরের মতো চুঁইয়ে নামবে—এই শ্রান্তিহর লক্ষ্যই যেন মাতিস মনে-মনে ভেবে নিয়েছিলেন।

Action-সম্প্রদায়ের শিল্পে শান্তি নেই, যা আছে তা সর্বনাশের স্বাক্ষর। তবু-যে শেষ পর্যন্ত ঠিকুজী-কুলজী প্রমাণের তাগিদে মাতিসকে নিয়েই টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে, তার কারণ সম্ভবত কীর্তি এবং খ্যাতির মধ্যবর্তী দুস্তর সময়ব্যবধান। এখনো অনেকের কাছেই মাতিসের প্রধান পরিচয় ১৯০৪-০৫ সালের ফভ্-পর্যায়ের দুর্ধর্ষ নেতা হিশেবে। সে-সামান্য কয়েকবছর রঙের ব্যবহার নিয়ে অদ্ভুতিকম্ভুত নিরীক্ষাদি অক্ষৌহিনীর মতো তাঁর খ্যাতির শরীরে জড়িয়ে থেকেছে। পরবর্তী প্রায়-পঞ্চাশ বছরের নানা মহৎ কীর্তি যেন কিছুই নয়, পুরোনো লোকপ্রবাদই সব। Action-গোষ্ঠীর মাতিস-আরাধনাও এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসকে একপাশে সরিয়ে রেখে।

কিন্তু এ-ধরনের একদেশদর্শিতা, আর যা-ই হোক, কোনো যথাযথ উপলব্ধিতে পৌঁছুবার সহায়ক নয়। রঙ ব্যবহার বিষয়ে মাতিসের ধারণা কোনো-এক বিশেষ জায়গায় কখনোই থমকে থাকেনি। যে-অসংখ্য অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মাতিস নিজের শিল্পকে অহরহ পরিস্রুত ক'রে নিয়েছেন, তাদের প্রকৃতি বুঝতে হ'লে সামান্য একটু আলোচনার প্রয়োজন।

চিত্রকলার ঐতিহ্যে দুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য রঙের-প্রয়োগে স্বীকৃত হয়ে আসছিলো।

প্রথম প্রয়োগ কতিপয় গঠনের নিছক অলংকরণের খাতিরে, যেমন ভেরোনীজ চিত্রাবলীতে। বর্ণব্যবহারের আরেক প্রকরণ ভ্যান গঘের শিল্পে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এখানে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য এক দুর্জয় প্রাণের বিদ্যুৎপ্রবাহে চিত্রটিকে রোমশ চঞ্চল ক'রে তোলা। কিন্তু এই কোনো ব্যবহারেই রঙ্ প্রধান ভূমিকা দখল ক'রে নেই। এমনকি ভ্যান গঘের শিল্পেও রঙের যে-অপরিহার্যতা, তা উপকরণ হিশেবে; এখনো পর্যন্ত তা অধিকরণ হয়ে ওঠেনি। মাতিসে বিপ্লব আরো বহুদূর এগিয়ে গেছে। রঙ্ আর-কোনো দ্বিতীয় পুরুষ নয়, প্রধান নায়ক; অলস অলংকরণ নয়, প্রাণশক্তির উৎসও নয়—মাতিসের তুলির ছোঁয়ায় রঙ্ নতুন-এক বিন্যাস শিখে নিয়েছে যেন, ক্যানভাসের শরীর ছাপিয়ে যা উপ্‌চে পড়ে। আসনে উপবিষ্টা কোনো রমণীর দিকে তাকাচ্ছি, কিন্তু সত্যিই কি নারীর দিকে তাকাচ্ছি, আসলে যা দেখছি তা তো কোনো রঙের সুষমা : নারী আর রঙ্ একাকার হয়ে গেছে। লাল ডোরা-কাটা টেব্‌লের ঢাকনা : কী দরকার আমার মনে রেখে ওটা শাদা কাপড়ে লাল ডোরা-কাটা, যা দেখছি তা তো লাল আর শাদা রঙের সমন্বিত মাধুরী সমাবেশ। মাতিসে শাদা, লাল, কালো, সবুজ, সোনালি, খয়েরি ইত্যাদি রঙ্ তাদের আলাদা-আলাদা সত্তা নিয়ে, আবেগ নিয়ে উপস্থিত; প্রত্যেকটি রঙ্ থেকে যেন শক্তিচ্ছুরিত হচ্ছে। অথচ তৎসত্ত্বেও তারা যেন জলের মতো, টলোমলো প্রবাহের মতো, লঘুসুর কোনো গানের কলির মতো। রঙ্ তার সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

অবশ্যই এ-শিল্পসিদ্ধতায় উত্তীর্ণ হবার সাধনায় তাঁকে কিছু-কিছু ওলটপালট, অদল-বদল, বিকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু বিরোধ-বিসংবাদ যা দেখা দিয়েছে তা সাধারণের গতানুগতিক শিল্পবিচারে আঘাত পড়েছে ব'লেই, মাতিস নিজে কখনো বিষয়ের প্রকৃতিবিকৃতি ঘটাননি। কোনো ছবির যথাযথতম বর্ণসুষমা আবিষ্কারের তাগিদে তিনি বার-বার ক'রে ছবিটির স্কেচ আঁকতেন, অনেকরকম রঙ্ সমাবেশ নিয়ে পরীক্ষা করতেন। প্রত্যেকটি পরিলব্ধ ছবির পিছনে এই কায়িক পরিশ্রমের ইতিহাস। এমন-এক রঙের জাদু-যোটক ঘটাতে হবে যা বিষয়ের স্থির প্রকৃতির সঙ্গে এক স্তরে এক গ্রামে এক স্পন্দনে মিশে যেতে পারে; স্কেচের পর স্কেচ জুড়ে এই সার্থকতম বিবাহসন্ধান। স্বীকার করতেই হয়, মাতিসের অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়নি। তাঁর শেষ-পর্যায়ের যে-কোনো ছবির দিকেই তাকানো যায়, বিষয়ের নিটোল সত্তা যেন প্রসন্ন আহ্বান জানায়—হয়তো কোনো নীলাম্বরী নারী, হয়তো একটি ঘর, কিংবা শাদা টেব্‌লের উপর ঝুঁকে-পড়া কোনো মেয়ে। আবিষ্ট হয়ে আমরা এগিয়ে যাই, পরমুহূর্তে উপলব্ধি করি একটা-কিছু ঘটছে, বিষয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বর্ণের মহাসমুদ্রে আমরা ভাসছি। সে এক আশ্চর্য সমুদ্র, দিগন্ত পর্যন্ত তার মহিমার ব্যাপ্তি, অথচ সহস্র টুকরো-টুকরো ঢেউয়ের দোলানিও যেন; এক-একটি ঢেউ এক-এক বর্ণসুষমায় উদ্বেল। সে-সমুদ্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, তবু ঢেউ-থেকে-ঢেউয়ে উজ্জ্বল গতির আনন্দ।

শিল্প এখানে মহত্তম হয়ে উঠেছে। ভ্যান গঘের প্রভাস চিত্রাবলীতে যেমন, একটি বিশেষ রঙকে গুরুত্ব দান ক'রে কোনো ছবিকে উদ্দীপ্ত বহ্নিশিখা ক'রে তোলা চলে। অথবা ব্যবহৃত সব-ক'টি রঙকে সমান নিষ্প্রভ ক'রে অন্যধরনের কোনো সুষমাও ফুটিয়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মাতিসের প্রব্রজ্যা এর কোনোদিকেই নয়। অজস্র করতালের মতো তাঁর ক্যানভাসে রঙে-রঙে মুখোমুখি সংঘাত, হলুদে-সবুজে-নীলে-আগুনে-শাদায়-ধূসরে পাশাপাশি একসঙ্গে রলরোল; নৈরাজ্যের আশঙ্কায় আমরা দু'কান ঢেকে নিয়ে আসি, পরক্ষণে বিস্ময়ে হতচকিত হ'তে হয় : প্রলয়ের বজ্রঘোষ নয়, অস্ফুট লজ্জার নূপুরনিক্কণ।

সম্ভবত মাতিস তাঁর শিল্পাদর্শের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছিলেন জীবনের শেষ পনেরো-কুড়ি বছরের কারুকর্মে। এমন নয়-যে সত্তরে পৌঁছুবার আগে বহু অপরূপ সুন্দর ছবি তিনি আঁকেননি, কিন্তু মনে হয় মনন এবং চিত্রণের পরিপূর্ণ সাযুজ্যের জন্য সায়াহ্নসময় পর্যন্ত তাঁকে সাধনায় থাকতে হয়েছে। বর্ণের মোহিনী জাদু যত বড়োই হোক, মাতিস ক্রমশই এ-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন যে আসলে শিল্পকর্মে অন্বীক্ষা ও অন্তর্বোধই প্রধান। এক-একটি রঙ্ এক-এক বিশেষ আবহে বিশেষ-কোনো বোধের প্রতীক, এবং যেহেতু একসঙ্গে বহুবিধ প্রতীপ-অন্বীক্ষার সমাবেশ সম্ভব, কোনো চিত্রে বিভিন্ন বর্ণের সমান্তরাল, সমধর্মী উপস্থিতিও তাই আজগুবি ব্যাপার নয়। বিষয়ের প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণব্যবহারের অন্বয় ঘটাতে হ'লে অতএব অন্তর্বোধে ফিরে যেতে হবে, প্রেরণা হাৎড়ে ফিরতে হবে। যুক্তিবিচারে হয়তো পর-পর কয়েকটি বর্ণসুষমা মনে এলো যা বিষয়ের সত্তার সঙ্গে সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারবে। এবার তাহ'লে বাছাইয়ের কাজ, নেপথ্য থেকে উজ্জ্বল সভাস্থলে নিয়ে আসতে হবে বিশেষ একটি বর্ণসরঞ্জামকে। প্রাগন্বীক্ষার অবলম্বন ছাড়া এখানে অন্য উপায় নেই, যদিও মাতিস এই সোপানে পৌঁছেছিলেন অনেক নিরীক্ষার নির্যাসে নিজের চেতনাকে পরিপুষ্ট ক'রে নিয়ে। এই প্রাগন্বীক্ষা যাঁর যত শাণিত, তিনি তত বড় শিল্পী।

প্রথম জীবনে, সেই ফভ্-পর্বে, তাঁর রঙ্ব্যবহার অন্তর্বোধের দীপ্তি যথেষ্ট আহরণ করেনি। ফভ্-গোষ্ঠীর চিত্ররূপে অভিনবত্ব আছে, চাতুর্য আছে, স্বচ্ছতা আছে, কিন্তু প্রাণের সঞ্চার নেই যেন। বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত মাতিসের শিল্পে এই অভাববোধ প্রকট হ'য়ে ছিলো। দৃষ্টান্ত হিশেবে Goldfish ছবিটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দরজার ফ্যাকাশে-কালো রঙের জ্যামিতিক সংস্থাপন, ডানকুনি নানা কিউবিকধর্মী খয়েরি ছায়া, দেয়ালের ফিকে-নীল সমান্তরলতা, নিরালম্ব-বায়ুভূত টেবিলে পাত্র, স্তিমিত জলে ফিকে-সবুজ আভা : তার মধ্যে ছিটকে-বেড়ানো উগ্র-লাল মাছ—একটি বিদ্যুৎপ্রভ বিস্ময় নিঃসন্দেহে হৃদয়কে তোলপাড় ক'রে তোলে। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী মুহূর্তে আশাভঙ্গের দোলা ও; কারণ প্রশ্ন এসে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করে এর পর কী, এই-যে আবেগ শীর্ষে উঠে এলো, তার পরিণতি কোথায়।

বোধকে বাদ দিয়ে, নিছক বর্ণের উপর নির্ভর ক'রে খুব বেশি দূর এগোনো যায় না : এ-উপলব্ধিজাত অতৃপ্তি থেকেই তাই মনে হয় মাতিস ফভ্-গোষ্ঠীর সম্মোহন পেরিয়ে অন্যত্রগামী হলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি পর-পর অনেকগুলি interior এঁকেছিলেন; বর্ণের দুরন্ত সমাবেশে সব-ক'টিই সমান লোভনীয়, কিন্তু তবু সন্দেহ করতেই হয় রঙগুলো যেন এলোমেলো খেয়ালখুশিতে জড়ো করা, সব-মিলিয়ে প্রগাঢ় সংকেতময় কোনো গতির অভাব। আরো এক-ধাপ এগিয়ে এলে ওদালিস্ক-পিরিয়ড। এতদিনে বর্ণ-ব্যবহার যদিও অনেক স্বতঃস্ফূর্ত এবং দ্যোতনাময়, তবু তাঁর শিল্পাদর্শ এখনো পরিপূর্ণ নির্বাণ পায়নি। মাতিস এ-পর্যায়ে ক্যানভাসের ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ-বিশেষ রঙের মহিমা ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত, কিন্তু সামগ্রিক অখণ্ডতার কিছু যেন বাকি। তম্বুরালগ্না ওদালিস্ক-চিত্রটি ধরা যেতে পারে। মেঝের গাঢ়-লাল রঙ্ অপরূপ স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু বাঁ-পাশে নিকষ-কালো হয়ে নেমে-আসা অন্ধকারের সঙ্গে ঠিক সাযুজ্য ঘটেনি। ফিকে-সবুজ দেয়াল আর খোলা জানালার ফাঁকে নীলাকাশের পটভূমিকা মনোমুগ্ধকর, কিন্তু তার সামনে সবুজ-হলুদ কুশন-জড়ানো চেয়ারটি সুষমায় স্থাপিত নয়, বরং উদ্ধত বিরক্তি। উপবিষ্টা নারীকেও মনে হচ্ছে বেমানানরকম প্রলম্বিতা—ত্বকের শাণিত সোনালি মসৃণতার

পাশাপাশি চুলের, স্তনবৃন্তের, কটির, যোনিপ্রদেশের রহস্য ইশারায় ঘন : অথচ তাহ'লেও মনে হয় বিচ্ছিন্ন-কোনো চিত্র।

কিন্তু মাত্র কয়েকবছরের ব্যবধানেই জাদুকরী ছোঁয়া লাগলো, মাতিসে রঙ্ এবং অনুভাবনা এক হয়ে গেলো। রঙ্ একাকিত্বের অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে বোধের শরীরে মিশে গেলো; এক নয়, অসংখ্য রঙ্, তাদের পারস্পরিক আশ্লেষে অথচ ব্যভিচারের মন্ত্রণা নেই। শাখানদী-উপনদী হাতে হাত মেলালো, এবার লক্ষ্য সমুদ্র, যাতে সাতরঙের অনাদি-অনন্ত আভাস; সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ প্লাবনের আনন্দও।

সুতরাং বলতেই হয় সাম্প্রতিকতম abstract expression-এর সঙ্গে মাতিসের বর্ণব্যবহার প্রণালীর আত্মীয়তা আছে এমন উক্তি অন্যায় আতিশয্য। নৈরাজ্যে মুক্তি কোনো পর্বেই মাতিসের লক্ষ্য ছিলো না। তাছাড়া, যদিও তাঁর চিত্রকর্মে বর্ণব্যবহারই প্রধান পুরুষ, আধার কখনোই অনুপস্থিত নয়। বরঞ্চ বলা চলে আধারের প্রেরণায় সম্পৃক্ত ক'রে নিয়েই মাতিস ক্যানভাসে রঙের প্রলেপ লাগাতেন। হালের ঘোড়সওয়াররা যতই প্রতিবাদ করুন, তাঁদের অনুসৃত পথে মাতিসের শিল্পকলার ধ্বংসতম অঙ্কুর-চিহ্নও নেই।

কাঠামোর বাইরে, নিয়মের বাইরে পরীক্ষায় ব্যাপৃত হবার আকৃতি ইতিহাসের প্রতি-যুগের আবেগ, actionist-দের অস্থৈর্যকে তাই আপাতত বিকৃতি ব'লে গাল না-পাড়াই হয়তো শ্রেয়। কিন্তু যেখানে ঐতিহ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে এগোনোই প্রধান সংকল্প, পিতৃপুরুষ অনুসন্ধান তো সে-অবস্থায় অবান্তরতা। তাছাড়া, সংঘাত-সম্প্রদায়ের শিল্পীরা যতই নজির দেখান না কেন, এমনকি ফভ্-ঋতুর মাতিসেও তাঁদের কাহিনীর পূর্বলেখ নেই, সেখানেও আধারের আংশিক অনুশাসন। শেষ পর্যন্ত অতএব সম্ভবত তাঁদের একমাত্র ঐতিহাসিক ভরসা পল ক্লী।

নীল রাত্রি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের সবটা ব্যাপার মনে পড়তে নীরদ নিজের মনে হাসল। বস্তুত কি কারণে তার মনের অবস্থা ওরকম দাঁড়িয়েছিল তলিয়ে আর এখন সে ভাবতে গেল না। সময় নেই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে, একটা অহেতুক বিভীষিকা নিজের মন থেকে তৈরী করে সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এটাই সত্য।

হরির মার কড়া নাড়া হাঁক ডাক শুনে সে বিছানায় উঠে বসল, আর চিন্তা করল, 'রজ্জু দেখে আমি সর্পভয় পেয়েছি। আমার সমস্ত ভাবনাটাই ভুল হয়েছিল, ভুল পথ ধরে চিন্তার সূত্র টেনে টেনে কোন এক ভয়ংকর অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছিলাম, আরে রাম!'

'দাদা বাবু! আমার খোকন সোনা!'

'খুলছি খুলছি, আমি জেগেছি।'

'খুলছে, মাসি, বাবা এখুনি দরজা খুলে দিচ্ছে।'

ওধারের বিছানায় সদ্য ঘুম ভাঙা খোকন হাই তুলছে, বাইরে মাসির ডাক শুনে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে এপাশে বিছানায় বাবাকে দেখছে। বাবা গম্ভীর, বাবাকে মনে হয় যেন একটু অসুস্থ। উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গিটা ভাল করে পরছে। কেবল মাসির ডাকের উত্তর দেওয়া ছাড়া খোকন আর কিছু বলল না। আর একটা হাই তুলল শুধু।

নীরদ খাট থেকে নেমে দরজার ছিটকিনি নামিয়ে দেয়। পাল্লা দুটো খুলে যায়।

'এই নাও, তোমার টিপবাতি খারাপ হয়ে গেল, কাল কি আর সারারাত আমার ঘুম হয়েছে। যন্তরটা খারাপ করে ফেললাম। সিঁড়ির পথটা তো ভালয় ভালয় নামলাম। নীচে গলি ছেড়ে সদর রাস্তায় গেছি, ওমা, আর তো জ্বলছে না, কত টেপাটেপি করলাম, উঁহু।'

শুকনো মুখে নীরদ হাসল, হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল। একটু নাড়াচাড়া করল। তারপর সেটা টেবিলে রেখে দিতে দিতে বলল, 'খারাপ হয়েছে কে বলল হরির মা? ব্যাটারি ফুরিয়েছে। আজ আবার আমি ব্যাটারি এনে রাখব।'

'নাগো দাদাবাবু, আমার ভয় করে, আমার কেবল ভয় আমার হাত লাগলে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'বলছি তো নষ্ট কিছু হয়নি।' নীরদ হাত বাড়িয়ে টুথব্রাশ পেস্ট তুলে নিল, তোয়ালেটা টেনে আনল র‍্যাকেট থেকে। 'আর যদি নষ্টই হয়, ঠিক করে আনা যাবে, অত ভয় কেন তোমার।'

হরির মা ততক্ষণে বাবুর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কেমন আছ সোনা আমার, রাতে ঘুমটা ভাল হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মাসি।' বাবু হাসল। 'তা তুমি অত ভয় করছ কেন, বাবা কি বলছে শুনলে তো, নষ্ট হলে টর্চ লাইট ঠিক করে দেবে। টর্চ লাইট না হলে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তুমি নামতে পারবে নাকি। যা বিচ্ছিরি সিঁড়ি আমাদের।'

বাবুর হাসি মুখ দেখে হরির মার মুখখানা এই প্রথম হাসিখুশি হয়ে ওঠে। ঘাড় ফিরিয়ে নীরদের দিকে তাকায় একবার। তারপর আবার বাবুর চোখের ওপর চোখ রাখে।

'আমার বাবা একটা কেরাসিনের ডিবি হলে কাজ চলে যায়। সিঁড়ি আর গলিটা তো পার হওয়া। সদর রাস্তায় উঠলে আর ভয়টা কি। রাজ্যের ইলেক্ট্রি বাতি চাঁদের রোশনাই ঝড়ায়।'

'ইলেক্ট্রি' কথাটা শুনে বাবু খিলখিল হাসে। নীরদ হাসছে কিনা হরির মা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বলে সে দেখতে পায় না। হরির মা হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়।

'তাই তো চলতো, একটা ডিবি জেলে বেশ আমি নীচে নামতে পারি। কাল যন্তরটা খারাপ হল আর এমন ভয় ঢুকল মনে, অপরের জিনিস, কত দামী বাতি, ভাবনায় ভাবনায় রাতে আর ঘুম আসে না চোখে।'

'আমরা কি এখনও তোমার পর আছি হরির মা।' এবার নীরদ শব্দ করে হাসল। 'তা ছাড়া আড়াই টাকা দাম গুটার। খুব দামী জিনিস না।' বলে নীরদ মুখে রাশ গুঁজে বাইরে প্যাসেজের কলের দিকে চলে গেল।

'শুনলে, শুনছো তো বাবার কথা।' বাবুর চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে ওঠে। 'তুমি আমাকে এত ভালবাস, বাবাকে এত ভালবাস, আমরা কি তোমার এখনও পর আছি। আড়াই টাকা মোটে টের্চের দাম। পঞ্চাশ টাকার একটা জিনিসও যদি তুমি ভেঙে ফেলে নষ্ট করে দাও, আমরা কিছু বলব না, আমি তো না-ই, বাবাও না, বুঝলে মাসি, বাবার মনটাও খুব নরম, খুব ভালমানুষ আমার বাবা।'

হরির মা আর কিছু বলল না। হাত দিয়ে বাঁ চোখটা মুছল। নীরদের খাটের কাছে সরে গিয়ে বিছানাটা টেনেটুনে ঠিক করে দিল, সুজনিটা ঝেড়ে দিল বালিশ দুটো আর একটু ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে সোজা করে রাখল, তারপর ফিরে এল বাবুর বিছানার কাছে। 'আমি উননে আগুনটা দিয়ে আসি বাবা, দাদাবাবুকে চা করে দিতে হবে, তোমার হার্লিকের জল গরম করব, এসে তোমার মুখ ধুইয়ে দেব।' তারপর যেন কি খেয়াল হল বুড়ির। 'ওমা, দাদাবাবু মুখ ধুতে বাইরের কলে চলে গেল! আমি তো কাল বালতি কলসী সব ভরে রেখে গেছি। কি দরকার ছিল বারান্দার কলে ছোটার। এজমালী কল, সকাল বেলা কি অবসর আছে,—গিয়ে না দাঁড়িয়ে থাকবে কলতলায় একটা ঘণ্টা।' বিড়বিড় করতে করতে বুড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে কলসী বালতি সব শূন্য দেখে বুড়ি একটু অবাক হল। এত জল তো লাগবার কথা নয় দাদাবাবুর। তবে কি— প্রশ্নের উত্তর সহজে মিলল। 'রাতে চান করেছে দাদাবাবু, তাই তো সবটা জল লাগল।' বুড়ি নিজের মনে বলল, 'তা অত রাতে চান করা কি ভাল। এখন বাদলার দিন আরম্ভ হয়েছে, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে না অসুখ-বিসুখ করে।' যেন বুড়ি কল্পনা করল দাদাবাবুর জ্বর হয়েছে। খোকা এক বিছানায় দাদাবাবু আর এক বিছানায় শুয়ে। বুড়িকে এখন দুজনের শুশ্রূষা করতে হচ্ছে। দাদাবাবুর আপিস কামাই চলেছে একটানা উনিশ দিন। আ, মরণ! বুড়ি চমকে উঠল। হঠাৎ কেন কুভাবনা করছে সে। ভাল না ভাল না। 'ভগমান, মা কালী, শীতলা ঠাকরুণ আমার অসুখ দাও, আমার মরণ দাও। দাদাবাবু বাঁচুক। খোকা সকাল সকাল ভাল হয়ে উঠুক। বুড়িকে সংসার থেকে তুলে নাও। শক্ত সমর্থ থেকে দাদাবাবু রোজগার করুক, বিষয়-সম্পত্তি বাড়ি-ঘর করুক। হরি হরি!' বুড়ি বালতি কলসীর কাছ থেকে সরে এসে কোণার দিকে ঘুটে আনতে পা বাড়াল। সে কল্পনাই করতে পারল না কাল বমি ধুতে নর্দমা পরিষ্কার করতে নীরদকে বালতি কলসী উপুড় করে জল ঢালতে হয়েছিল।

কলতলায় কেউ নেই। ওপাশের দুটো ঘরের দরজা তখন পর্যন্ত বন্ধ। দেখে নীরদ নিশ্চিন্ত হল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ইচ্ছামতন দাঁতে ব্রাশ ঘষল তারপর ট্যাপ খুলে বার বার আঁজলা ভরে প্রচুর জল মুখে পুরে কুলকুচি করলো। মুখের ভিতরটা ভারি শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্মল মনে হতে লাগল তাঁর। তেমনি তার মন। হাল্কা বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই ময়লা নেই অন্ধকার নেই হতাশা নেই অস্থিরতা নেই। দিনের আলোর মতন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন স্থির সংযত। নীরদ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, সামান্য একটা কথার কত সাংঘাতিক অর্থ করা যায়, সাধারণ একটু অভিমানের কত নিগূঢ় ব্যাখ্যা করে ফেলে মানুষ নিজে ঠকে অপরকে ঠকায়। কিছুই তো বলেনি কাল মালা। খুব স্বাভাবিক, নীরদকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে ও একটু হতাশ হবে অভিমান করবে। এটাই স্বাভাবিক। মান আর অভিমান। হৃদ্যতার ব্যাপারে, ভালবাসার প্রেমের জগতে চিরকালের সেই মান অভিমান চোখের জল আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে চিন্তা করে নীরদ নিজের মনে হাসল। এগুলো নারীর সৌন্দর্য এগুলো নারীর কমনীয়তা অতিরিক্ত বিভা। নারীদের সুন্দর, (সব নারীর না যদিও) কিন্তু দেহের অতিরিক্ত আরও কিছু সৌন্দর্য, যেমন চোখের জল অভিমান কটাক্ষ ভ্রূবিলাস হেঁয়ালীপনা ইত্যাদি আছে বলে নারী পুরুষকে মুগ্ধ করে আচ্ছন্ন করে। তাই কি? মালার এই গুণগুলি আছে, নীরদ কদিনে জেনে ফেলেছে। যদিও নীরদ এসব অপছন্দ করে না। কিন্তু যদি না থাকত, অভিমান অশ্রু দীর্ঘশ্বাস কটাক্ষ কিছুই সে মালার মধ্যে না দেখত, তার খারাপ লাগত না; মালাকে ভাল লাগার ব্যাপারে তেমন যে একটা তারতম্য ঘটত নীরদ মনে করে না। হ্যাঁ, সে চিন্তা করে, যৌবন অতিক্রান্ত পুরুষ সে। তার ফলে বেশীর ভাগ মানুষ যা হয়। প্রয়োজনের কথা সে আগে চিন্তা করে বাস্তবকে বেশী বোঝে। হাওয়া কোকিলের ডাক আকাশের রঙ এবং শুধুই অধরের ভঙ্গিমা নিয়ে মত্ত থাকা এ বয়সে মানুষের শোভা পায় না আর নীরদের ধাতেও এসব দেয় না। সুতরাং যেদিন মালার দিকে সে হাত বাড়িয়েছিল সেদিন মনে কোন হেঁয়ালী না রেখেই সে কাজটা করেছিল। মালার সুন্দর দেহটা স্পর্শ করেছিল। সে তৃপ্ত। মালার দিক থেকেও তার প্রয়োজন ছিল। না হলে এত সহজে ও সাড়া দিত না। সব সমস্যা সব প্রশ্ন এখানেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ফুরায় কি। কাল রাত্রে নীরদ নিঃসংশয় হতে পেরেছে। মালার মন এভাবে তৈরী না। দেহের অতিরিক্ত আরও কিছু দেবার নেবার স্বপ্ন দেখেছে ও। 'থোকনের জন্য আটকাবে না, থোকন আমাকে ভালবাসে।' কী অদ্ভুত চিন্তা! অথচ—

ওদিকের দরজার ওপর চোখ বুলিয়ে নীরদ কলতলা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে এল।

উননে আঁচ দিয়ে হরির মা বাবুকে মুখ ধোয়াচ্ছে। কোনো কথা না বলে নীরদ টেবিলের ড্রয়ার টেনে প্যাড ও কলম বার করল। একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট ধরিয়ে একটু সময় চিন্তা করল। তারপর কলম তুলে সে চিঠিটার একটা খসড়া করতে আরম্ভ করল। অনেক কাটাকুটি করতে হল। তা হলেও শেষ পর্যন্ত সবগুলো কথা বেশ পরিষ্কার করে সে প্রকাশ করতে পারল। ভাষাটা বেশ সহজ হয়েছে দেখে নীরদ খুশি হল। কাব্যটাব্য কিছুই করল না সে। খসড়া হয়ে যেতে নীরদ সেটার একটা কপি তৈরী করে ফেলল। এবার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হল। সবটা চিঠি আগাগোড়া পড়ল সে। তারপর সেটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করল। একটা ভাঁজ দুটো ভাঁজ তিনটে ভাঁজ। মুড়ে কাগজটাকে ট্রামের টিকিটের মত ছোট করে ফেলল সে। কিন্তু তবু যেন বড় বড় লাগছে।

আবার ভাঁজ করল। এবার ডাকটিকিটের মতন ছোট হয়ে গেল চিঠি। নীরদ নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় ফেরাতে দেখল হরির মা টেবিলে চা রেখে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে নীরদ পরম তৃপ্তি অনুভব করল। অস্ফুট একটা 'আ' শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। সত্যি নীরদের খুব অনুতাপ হয় কাল সে এমন অসতর্ক হতে গিয়েছিল কেন ভেবে। 'তোমাকে ভুলতে চাইছি।' একথা শোনার পর কোন্ মেয়ে মাথা ঠিক রাখবে। কাজেই 'গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালা জুড়ানো' ধরনের কথা যদি মালার মুখ থেকে বেরোয় তা খুব অন্যায় হয় না। আসলে 'ভুলতে চাইছি' বলাটাই নীরদের অন্যায় হয়েছে। মনে যে-কথা আছে সর্বত্র সব সময় সেটা প্রকাশ করা মূর্খতা। যা হোক নীরদ শেষ পর্যন্ত সামলে গিয়েছিল। এবং এই চিঠি মালার মন থেকে বাকী সংশয়টুকু মুছে দেবে। 'ঠাট্টা করছিলাম, তোমার মন পরীক্ষা করছিলাম।' 'পরীক্ষা' কথাটা কাল নীরদ বলতে পারে নি, মনে আসে নি, আজ চিঠিতে তা বসাতে পেরে সে অধিকতর নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত আরামে সে এখন বড় একটা হাই তুলল তারপর চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হরির মা চামচ নেড়ে নেড়ে কাচের গ্লাশে হরলিক্স তৈরী করছে। লুব্ধ প্রশান্ত চোখ মেলে বাবু সেদিকে তাকিয়ে আছে। নীরদ খোকার বিছানার ওধারে ঘুরে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল। দুটো পাল্লা ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে দুদিকের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। হলদে রোদের ছটায় ঘরের ভিতর উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে নীরদ ছেলের কপাল স্পর্শ করল। মিটিমিটি হাসছে বাবু। 'আজ আবার একটা খেলনা এনে দেব।' নীরদ সুন্দর করে হাসল। খোকা হেসে মাথা নাড়ল। 'খেলনার দরকার নেই, বাবা, তার চেয়ে আর একটা গল্পের বই এনে দিও।'

'উহুঁ।' হরির মা মাথা নাড়ল। 'বই পেলে সারাদিন ওটা চোখের ওপর ধরে রাখে। এমন ধারা করলে চোখটা না খারাপ হয়ে যায় দাদাবাবু।'

বাবু ঈষৎ বিরক্ত হল মাসির কথায়। ছেলের চেহারা দেখে নীরদ বুঝল। কথা বলল না। চুপ করে রইল।

'চোখ খারাপ হবে না, তুমি এনে দিও বাবা অ্যাডভেঞ্চার গল্প। আগেরটার মতন।'

'তাই দেব।' নীরদ সস্নেহে ঘাড় কাত করল।

'কি জানি, বাপ বেটায় মিলে তোমরা যা খুশি কর। আমার কথার দাম কি।' বুড়ি বিরক্ত হয়ে চামচটা জোরে জোরে নাড়তে থাকে। কথাটা খুব মিথ্যা না, নীরদ চিন্তা করল, সারাদিন এমনি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আছে ছেলের। তার ওপর সব সময় বই খুলে চোখের সামনে ধরে রাখাটা ঠিক না। চিন্তা করল নীরদ, আর অবাক হল। অশিক্ষিত একটা ঝিয়ের বিজ্ঞানসম্মত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ভেবে। আশ্চর্য এর বোধশক্তি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।' নীরদ ছেলের বিছানার পাশ থেকে সরে এল। 'বইও এনে দেব খেলনাও এনে দেব। একটু সময় বই পড়বে, একটু সময় খেলনা নিয়ে থাকবে। সেই ভাল তাই ভাল হবে।' বলতে বলতে নীরদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কেমন আমার কথা দাদাবাবু রাখল তো, রাখবে না আবার, আমি যেমনটি বলব, দাদাবাবু তেমনি করবে, দিদি করে নি? আমার কথা ঠেলতে দিদি পর্যন্ত সাহস পায় নি।' গ্লাশটা বাবুর মুখের সামনে তুলে ধরে বুড়ি দাঁত বার করে হাসল। বাবু প্রথমটায়

ঠোঁট ফাঁক করতে আপত্তি করল। তারপর কি ভেবে গ্লাশে চুমুক দেয়। ঢোক গিলে পরে হাসে। 'আমার কথাও তো রাখছে বাবা, শুনলে তো, খেলনার সঙ্গে বইও আসছে। তবে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমারই জিৎ হল, ডবল জিৎ।' মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বুড়ি আবার গ্লাশটা বাবুর ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল। 'সবটা শেষ করে ফেল দিকিনি এইবেলা, আমার রাজ্যের কাজ পড়ে আছে ওদিকে। ভাত তো চাপিয়ে এলাম। ডাল মাছের ঝোল সব নামিয়ে দিতে পারব কি দাদাবাবুকে—'

'আমার মাছের দরকার নেই হরির মা।' যেন চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরদ কথাটা শুনেছে। 'ডাল আর একটা কিছু ভাতে হলে চলবে। পরে তুমি মোড়ের বাজার থেকে যা হোক একটু মাছ এনে খোকাকে রেঁধে দিও, তুমি খেও। এখন তাড়াহুড়ো করে অত সব পারবে না।'

বাজারের কাজটা নীরদ অফিস ফেরার পথে সেরে আসে। মাছ শাক-সবজি খোকার জন্য ফল এটা ওটা দরকার মতন কিছু সরু চাল এমন কি সন্দেশের হাঁড়িটা পর্যন্ত একটা রিক্সায় করে সঙ্গে নিয়ে নীরদ রোজ ঘরে ফেরে। কিন্তু কাল আর সে বাজার করে নি। মাঝে মাঝে এমন হয়। অগত্যা হরির মাকে সকালে বাজারে ছুটতে হয়। নীরদ এটা চায় না। কিন্তু না পাঠিয়ে উপায় থাকে না, বুড়ির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে নীরদ বোঝে, তা হলেও একটু ভাল মাছ, টাটকা শাক-সবজি খোকাকে দিতেই হবে। এবং যেদিন এ অবস্থা হয় সেদিন নীরদ একবারের জায়গায় তিনবার কথাটা বলে। 'খোকা খাবে, তুমি খাবে।'

দুপুরে ঘরে ফেরা হয় না বলে বুড়ি এখানেই খায়। রাত্রে নিজের বাড়িতে খায়। এটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলেও দাদাবাবু যখন 'তুমি খাবে' কথাটা বলে বুড়ি কেমন বিব্রত বোধ করে, লজ্জা বোধ করে। যেন বাজার করার অতিরিক্ত কাজটা তাকে করতে হচ্ছে বলে দাদাবাবু তার মন রাখতে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে খাওয়ার কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, যেন না বললে সে বাজারে যাবে না।—ছি, ছি! বুড়ি মনে কষ্ট পায়। এই মন নিয়ে তো সে এখানে থাকে না, এই আশ্বা নিয়ে তো সে রোগা ছেলেটার সেবা করছে না। নীরদ যখন আর একবার কথাটা বলে হরির মা বিরক্ত হয়, কণ্ঠটা রাগে পরিণত হয়। 'খাব গো খাব খাব, না বললেও খাব। জীবনভর তো খেয়ে খেয়ে এলুম, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, চামড়া শুকিয়েছে তবু কি আমার পেটের আগুন নিভছে, রাবণের চিতের মতন জ্বলছে আর জ্বলছে—' বুড়ির কথার ধরন দেখে বাবু হাসে। নীরদ অবশ্য এসব শুনতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। তার মন অন্যত্র। চোখ দেখলে মনে হবে ভিতরে ভিতরে সে খুব অস্বস্তিবোধ করছে। প্রফুল্লকে একবার কলতলায় আসতে দেখল সে। নীরদের ইচ্ছা করছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা বলে। কিন্তু থামকা কথা বলার মতন আজ পর্যন্ত পরিচয়ই হল না চিন্তা করে নীরদ নিবৃত্ত হল। প্রফুল্ল হাত মুখ ধুয়ে কলতলা ছেড়ে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রফুল্লর স্ত্রী। 'ভীষণ অহংকার মহিলার।' নীরদ মনে মনে বলল, 'কতদিন আমাকে এই প্যাসেজ ধরে যেতে আসতে দেখেছে, কিন্তু একদিন তো চোখ তুলে মুখ তুলে তাকায় না। গায়ের ওই তো মেটে রং, মাংস বলতে কিছু নেই, তাতেই এত অহংকার। ভয় নেই, ভয় নেই আপনার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।' বলতে বলতে নীরদ ওদের দরজা পার হয়ে ঘোরানো সিঁড়ির মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। থু থু ফেলল নীচের দিকে তাকিয়ে। কাদের একটা কুকুর নীচে সিঁড়ির

গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাই কাই করছে। যেন কুকুরটাকে কেউ মেরেছে। আহত হয়ে কান্নাকাটি করছে ভয় পেয়েছে। চিন্তা করে নীরদ আবার ঘাড় ফিরিয়ে কলতলাটা দেখল। প্রফুল্লর স্ত্রী চলে গেছে। যেন কলটা খুলে গেছে। ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে জল পড়ার। আরও কয়েক সেকেণ্ড সে ঘাড় কাত করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ও এল। পিঠময় ছড়ানো চুল। যেন সকালেই কোন ফাঁকে স্নান করে গেছে মালা। পরনে একটা কালো চওড়া পাড় কাপড়। মন্থর গতি। হাতে একটা মগ। মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে কলতলার দিকে এগোচ্ছে। আশ্চর্য সুন্দর ফরশা দুটি হাত। শাদা শাড়ির সঙ্গে টিয়ে রঙের ব্লাউজটা কী চমৎকার মানিয়েছে। চিন্তা করে আস্তে আস্তে নীরদ সিঁড়ির মুখ ছেড়ে কলতলার দিকে এগোতে লাগল। তার হাতের মুঠোর মধ্যে সেই ভাঁজ করা ছোট্ট চিঠি। নীরদের বুকের ভিতর কেমন দুরদুর শব্দ হচ্ছিল।

নয়

'সো আর্লি!'

'নো ব্রাদার।' সুধাংশুর চোখে চোখ রেখে নীরদ হাসল তারপর নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল, 'নটা বেজে গেছে, নাইন সেভেন।'

'বোস বোস।' সুধাংশু নীরদের হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। 'এখান থেকে তোমার মিশন রো ড্যালৌসী যেতে আর কিছু একঘণ্টা লাগে না।'

'না তা লাগে না।' নীরদ মৃদু হাসল। 'ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব, তাই একটু সকালে বেরোলাম। দাও সিগারেট দাও।'

সুধাংশু হলদে সিগারেটের টিন নীরদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'কাল কখন বাসায় ফিরলে?'

'হ্যাঁ, দশটা হয়েছিল।' নীরদ সত্য কথা গোপন করল।

'তা কাল অমন হুট্ করে নেমে গেলে কেন?' সুধাংশু হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল। 'আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলে?'

'আরে রাম!' নীরদ সিগারেট ধরাল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে শব্দ করে হাসল। 'তোমার সঙ্গে বসে এটুকুন খেয়েই কাল নেশা হয়েছিল আমার, টু স্পীক দি ট্রুথ, তাই তো অত আবোল তাবোল বকছিলাম।' নীরদ এবারও মনের কথা গোপন করল। সুধাংশু বুঝতে পারল না, বরং বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে জোরে জোরে হাসল। 'আমি বুঝেছিলাম, আমি ঠিক ধরেছিলাম। তাই তো সেখান থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম তোমাকে নিয়ে। তবে গোড়ায় আমি একটা মস্ত ভুল করেছিলাম রাণু ভৌমিককে নিয়ে—'

'তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তা কি আমি বুঝিনি?' নীরদ এবার রীতিমত টেনে টেনে হাসতে লাগল। 'আমি জড়িয়ে গেছি ওর সঙ্গে এই তো, হা হা—কাল বাসায় ফিরে কথাটা মনে পড়ে আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। আরে রাম! এ-বয়সে কি আর এসব হয়।' হঠাৎ হাসি থামিয়ে নীরদ চোখে মুখে একটা বৈরাগ্যসূচক প্রশান্তি আনতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সুধাংশু নিবৃত্ত হল না।

'সব বয়সেই সব হয়, ব্রাদার, বিশেষ প্রেমের ব্যাপারে—'

বন্ধুর ঠাট্টা নীরদ গায়ে মাখল না।

'না হে ব্রাদার, ইচ্ছা থাকলেও আমার উপায় নেই,—একটা মা-মরা রোগা ছেলে নিয়ে আমি যে কী ভাঁষণ বিড়ম্বনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি—'

এবার সুধাংশু গম্ভীর হয়ে গেল।

লক্ষ্য করে নীরদের ভাল লাগল। একটু একটু করে তার চেহারায় হাসি ফুটতে লাগল। সিগারেটটা দুবার জোরে জোরে টানল তারপর সিগরেট নামিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'রোগা ছেলের কথাও না হয় এক সময় ভুলে গেলাম, কিন্তু তোমাকে—' নীরদ থামল।

'অ তা হলে আমার ভয়েই রাণুর সঙ্গে কিছু করা হচ্ছে না।' এবার সুধাংশু শব্দ করে হাসল।

'তাই তো, আমি যদি বলি তা ছাড়া আর কি।' নীরদ একটা বড় ঢোক গিলল, 'বাব্বা! কাল তোমার যা মিলিটাণ্ট এ্যাটিচুড দেখলাম—সত্যি ভয় পাবার মতন কিনা?'

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে সুধাংশু বলল, 'আমি কি মিথ্যা বলেছি,—বাস্তবিকই কি এসব নেস্টি ব্যাপার চোখে দেখা দূরে থাক কানে এলেও মেজাজ খারাপ হয় না? রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার জ্বলছিল তোমার ঐ চ্যাটার্জি সাহেবের কথা শুনে—লোফার, স্কাউন্ড্রেল!'

নীরদ কথা বলল না। ঘাড় নামিয়ে হাতঘড়ি দেখল। যেন এখন উঠলে ভাল হয়। 'আমি এখন চলি ব্রাদার।' চোখ তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল সে কিন্তু কথাটা বলতে পারল না। নীরদ লক্ষ্য করল সুধাংশুর চেহারা কালকের মতন শক্ত কঠিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই একটা প্রসঙ্গ কেন বার-বার ঘুরে ফিরে দু-জনের মাঝখানে আসছে চিন্তা করে নীরদ কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে সে অন্য দিকে তাকাল।

ঈশ্বর সহায়। হঠাৎ সুধাংশুর মুখ বন্ধ হল। আলমারীর পিছন থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল সুধাংশুর ডিস্পেনসারীর সেই ছোকরা কর্মচারী। যেন কাঁদছিল ও এতক্ষণ। চোখ লাল।

'কি ব্যাপার, আমাদের লালু মহারাজের কি হল।' অন্য একটা প্রসঙ্গ পেয়ে নীরদ প্রফুল্ল হল এবং সবটা মনোযোগ সে লালু মহারাজ মানে লালমোহনের উপর ঢেলে দিয়ে শব্দ করে হাসল।

'ওকেই জিজ্ঞেস কর—কি হয়েছে।' সুধাংশু গম্ভীর হয়ে টিন থেকে নতুন সিগারেট তুলল।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে মহারাজ, এসো আমার কাছে এসো।' নীরদ ছেলেটিকে আদর করে ডাকল। বস্তুত সুধাংশুর এই বালক কর্মচারীটিকে সে ভালবাসে। বছর চৌদ্দ বয়স। শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখ। যেন কোথায় নীরদের ছেলের সঙ্গে একটা আদল রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারে না সে তবু যখনই ছেলেটাকে দেখে নীরদের বাবুকে মনে পড়ে। খোকা একদিন এত বড় হবে। কিন্তু লালু যেমন সারাদিন ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়, সুধাংশুর ফাইফরমাজ খাটে, ঢিল ছুঁড়ে রাস্তার নিমগাছের মাথার কাক শালিক মারতে যায় কুকুরকে তাড়া করে বিড়ালের ল্যাজের সঙ্গে কখনো ঝুমঝুমি কখনও বেলুন বেঁধে দিয়ে হি হি করে হাসে তার খোকা কি এমন পারবে, মানে ততদিনে কি ও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে দু-পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে? যেন এখন আবার কথাটা চিন্তা করতে করতে নীরদ

লালমোহনকে আদর করে কাছে ডাকল। 'কি হয়েছে, নিশ্চয় আবার একটা দুষ্টুমি করেছিলে আর ডাক্তারবাবুর বকুনি খেয়েছ, কেমন তাই না?' নীরদ লালমোহনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকায়।

'কুকুরের ওপর ডাক্তারি বিদ্যা ফলাতে গিয়েছিলেন তোমার লালমোহন মহারাজ।' সুধাংশু হাসল না। তেমনি গম্ভীর থেকে গেল।

'বটে!' নীরদ আড়চোখে আবার ছেলেটাকে দেখে। মুখ নীচু করে হাতের নখ খুটছে। 'কি করেছিল?' ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে আস্তে নীরদ বন্ধুকে প্রশ্ন করল। এবং সেই সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে এইবেলা বেরিয়ে পড়তে হয় সুধা।'

'হ্যাঁ তোমার সময় হয়ে গেল।' সুধাংশু নিজের ঘড়ি দেখে পরে চোখ তুলল। 'কুকুরের ল্যাজে নাইট্রিক এসিড ঢেলে দিয়েছে তোমার লাল বাহাদুর।'

'কেন, কখন, কোথায়!' নীরদ অবাক হল।

'এই তো একটু আগে, একটা বাদামী রঙের কুকুর প্রায়ই আমার এই দরজাটার সামনে বসে থাকে, তুমি লক্ষ্য করে থাকবে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিটার সঙ্গে কথা বলছি, সেই ফাঁকে শ্রীমান আলমারী থেকে এসিডের বোতল নামিয়ে এই কাণ্ড করল।' একটু থেমে সুধাংশু বলল, 'অথচ এসব শিশি বোতল আমি কত সাবধানে রাখি, কতবার বলে দিয়েছি খবরদার এসবে হাত দিবিনি।'

'আরে ওর হাতটাও পুড়ে যায়নি তো?' নীরদ ব্যস্ত হয়ে লালমোহনের দিকে তাকাল। 'কেন হঠাৎ তোর মাথায় এই দুষ্টামি এল লালু? নাইট্রিক এসিড কী সাংঘাতিক জিনিস তুই কি—'

নীরদের কথা শেষ হল না। সুধাংশু বলল, 'ওদিকে হুঁসিয়ার আছে। ওকি হাত দিয়ে তুলেছে নাকি এসিড। একটা ড্রপার ঢুবিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে কুকুরটার ল্যাজে ছেড়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো তখন আমি আমার সিঁড়ির নীচে ওটাকে কাঁই কাঁই করতে দেখলাম। অনেকটা পুড়ে গেছে?'

'অনেকটা না পুড়লেও বেশ খানিকটা পুড়েছে। মাথায় দুষ্টামি এল ঠিক না, পরীক্ষা করে দেখল জন্তুর চামড়ার ওপর এসিডের অ্যাকশনটা কি—ডাক্তারী শেখার ওর ভয়ানক শখ কিনা।'

নীরদ এবার মৃদু হাসল। আনত মুখ লালুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবরদার আর কোনদিন এসব করবে না।'

'কাল দেখি ওর হাতে একটা শিশি। এইটুকুন একটা শিশি। কার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়ে গেছে, খালি শিশি পড়ে ছিল তাই কুড়িয়েছে বুঝলাম। হঠাৎ দেখি আলমারীর ওপাশে দাঁড়িয়ে শিশিটা গায়ের জোরে নাড়ছে। কি ব্যাপার। ডাকলাম কাছে। দেখি রবারের ক্যাপটা খুলে ফেলে শিশির মধ্যে কি খানিকটা ঢুকিয়েছে। শুঁখে বুঝলাম ফিনাইল। তা অত জোরে নাড়া কেন। দেখি শিশির ভিতর শুধু ফিনাইল না। দুটো মাছি তিনটে পিঁপড়ে পুরেছে।'

নীরদ এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

'মানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল কোনটা বাঁচে কোনটা মরে?'

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

নীরদ বলল, 'তা আজকাল চারদিকে বিজ্ঞানীরা ইঁদুর গিনিপিগের ওপর নানারকম এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে সুতরাং তোমার ডিস্পেন্সারীর লালু মহারাজও চুপ করে বসে থাকছে না আর কি—' নীরদ থামল। সুধাংশু নীরব। লালু এইবার পায়ের নখ দিয়ে সিমেণ্টে ঘষছে।

'তোমার সেই যে পাশ করা কম্পাউণ্ডার আসার কথা ছিল তার কি হল?' নীরদ প্রশ্ন করল।

'কোথায় আর এল।' সুধাংশু ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। 'আর এসেই বা করবে কি, পসারের তো অবস্থাটা দেখছ—রুগী কোথায়।' সুধাংশু বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোকা অসহায়ের মত অল্প অল্প হাসে।

বন্ধুর এই চেহারাটা নীরদের ভাল লাগল। হাল্কা একটা নিশ্বাস ফেলে সে ঘুরে দাঁড়াল। 'জমবে, কেন জমবে না পসার, এই তো সেদিন বসলে—যাক গে, আমি চললাম ব্রাদার, খবরদার লালু, ওষুধ পত্তর এসিড ফেসিডে হাত দিতে যেও না—চলি।' বলতে বলতে নীরদ চৌকাট ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। সুধাংশু এক দৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ নীরদ সদ্য পাট ভাঙা সুট পরেছে, টাইটাও নতুন, যেন একটু আগে জুতোর পালিশ ফেরানো হয়েছে। কাল রাত্রে নীরদকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে কত বুড়িয়ে গেছে। আজ মনে হচ্ছে নবীন—যেন সুধাংশুর চেয়েও সে তরুণ রয়ে গেল। চিন্তা করে ডাক্তার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

দশ

'অদ্ভুত মেয়ে!' রমলা মনে মনে বলল, 'তোমার সঙ্গে তাল রেখে চলি আমার বাপের সাধ্য কি।'

বস্তুত রাগ করতে জিদ করতে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে যেতে যেমন মালার জুড়ি নেই তেমনি এক একটা সময় আসে যখন আদরে সোহাগে মমতায় মেয়ে যেন উপচে পড়ে। সেই আদর সোহাগের টাল সামলাতে রমলার প্রাণ যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেও মুখটা বিশ্রী করে রেখেছিল মালা, রমলা লক্ষ্য করেছে। চানটান করে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা একেবারে বদলে গেল। কি ব্যাপার! 'কিচ্ছু দরকার নেই বৌদি তোমার এখুন উনুনে এসে, সারাদিন তো ইস্কুলে গাধার খাটুনি আছেই—তার ওপর বাচ্চাটাকে দেখতে পার না একটু, যাও, ভীষণ কাঁদছে, তুমি গিয়ে একটু দুধ দাও, আমি সব সামলে নেব। আর কি চায়ের জল ফুটে গেছে, কেটলি নামিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দেব। আমি—' বলতে বলতে বোধ করি ভিজে শাড়ি ওদিকের রেলিং-এ ছড়িয়ে দিতে মালা ছুটে গেল।

রান্না করতে রমলা আসেনি যদিও, কালকের ঘটনার পর সকালে উঠেই ওর হাতের তৈরী চা খেতে কেমন বিতৃষ্ণা লাগবে চিন্তা করে রমলা শুধু জলটা ফুটিয়ে নিতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু মালা তা-ও বৌদিকে করতে দিতে রাজী নয়। অল্প হেসে রমলা নিজের ঘরে চলে এসেছে।

'হাসছ কেন?' প্রফুল্ল প্রশ্ন করেছে।

'এমনি।' রমলা বাচ্চার মুখে স্তন দিতে ব্লাউজের বোতাম খুলেছে। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে প্রফুল্ল পরে বিড়ি টানতে চোখ বুজেছে।

এমন সময় মালা দু বাটি চা হাতে করে ঘরে ঢুকল। চা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মালার মুখখানা হাসি হাসি। ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। পরনের কাপড়টা ফর্সা। গায়ে যে ব্লাউজ উঠেছে তার রঙটা অন্য দুটো ব্লাউজের চেয়ে দেখতে ভাল। সব মিলিয়ে এমন স্নিগ্ধ সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল ও যে প্রফুল্ল খুশি হল। প্রসন্ন মুখে রমলা হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটি তুলে নিল। 'তোমার চা রেখেছ তো?' বৌদির চোখে চোখ রেখে মালা শুধু ঘাড় কাত করেছে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

'আজ মেজাজটা ওর ভাল দেখছি।'

প্রফুল্লর দিকে ঘুরে বসে রমলা চায়ের বাটিতে লম্বা চুমুক দিয়েছে। তারপর, 'তাই হাসছিলাম, তোমার বোনের মতিগতি বোঝা আমার সাধ্য না।'

'খুব স্বাভাবিক।' প্রফুল্ল হাসল না। 'ওর মনের অবস্থাটা তুমি বিবাহিত মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা আন্দাজ করতে পার। আমাদের শাস্ত্রের কথা পতিই সতীর গতি— কাজেই...' বিড়বিড় করে প্রফুল্ল পরের কথাগুলো কি বলল ভাল শোনা গেল না।

ওদিকে রান্নাঘরে গুনগুনিয়ে গান গাইছিল মালা আর চটপট হাত চালিয়ে এটা ওটা সেরে নিচ্ছিল।

এক সময় বেলা হল। রমলা চান করল, প্রফুল্ল চান করল। দুজনকে এক সঙ্গে ভাত খেতে দিয়ে মালা বাচ্চাটাকে চান করিয়ে জামা কাপড় পরিয়ে চোখে কাজল বুলিয়ে গলায় মুখে পাউডার মাখিয়ে রমলার কাছে নিয়ে এল। খাওয়া সেরে রমলা তৎক্ষণে কাপড় পরছে। প্রফুল্লর কাপড় পরা হয়ে গেছে। বিড়ি টানছে। বাচ্চাটা মালার কোল থেকে একবার বাবার দিকে একবার মার দিকে ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে 'বা' 'মা' করছে আর খিলখিল করে হাসছে। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ কেটে রমলা হাতে ব্যাগ তুলে নিল। বাচ্চা এইবেলা বুঝতে পারে মা এখন বেরোচ্ছে। আরম্ভ করল কান্না। প্রফুল্ল মালার কোল থেকে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে আদর করল চুমু খেল। কিন্তু কান্না থামে না। রমলা বাইরের পোশাক পরার পর বাচ্চাটাকে কোনদিনই কোলে নিতে চায় না। পাছে শাড়ি ব্লাউজ নোংরা করে ফেলে এই ভয়। আলগা থেকে শুধু গলা বাড়িয়ে দিয়ে শিশুর দিকে তাকিয়ে আদর জানাল চুমু খাবার ভঙ্গিতে দুই ঠোঁট সরু করে 'চুক' 'চুক' শব্দ করল। কিন্তু তাতে কি সন্তান ভোলে। কান্নার বেগ আরো বেড়ে যায়। 'তুমি থাকো বাবা, পিসিমার কাছে থাকো, পিসিমা তোমায় কত আদর করে কি সুন্দর করে চোখে কাজল পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু ভয় নেই, আমরা কাজে যাই,—সকাল সকাল ফিরে আসব তারপর তোমায় সারা সন্ধ্যা সারা রাত বুকে নিয়ে আদর করব।' বলতে বলতে রমলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে তাকায়। 'চলো, বেলা হল।' প্রফুল্ল ছেলেকে মালার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'চলো।' তারপর দুজন একসঙ্গে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মালা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়। একটু সময়। দুজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে আবার ও ঘরে ফিরে যায়।

একটানা আধঘণ্টা কেঁদে কেঁদে শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাটিতে একটু দুধ গরম করে খাইয়ে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল। মালা ওকে শুইয়ে দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত। শিশুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে কাপড় খুলে গিয়েছিল। কাপড় ঠিক করতে মালা বৌদির বড় আয়নার

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ব্লাউজের ভিতর থেকে টুক করে ডাক টিকিটের মতন ভাঁজ করা চিঠিটা মেঝের ওপর পড়ল। ওটার কথা এতক্ষণ ভুলে ছিল ও? মোটেই না। কতক্ষণে দাদা বৌদি বেরিয়ে যাবে তার অপেক্ষায় ছিল। নিজের মনে মুচকি হেসে নুয়ে মালা চিঠি কুড়িয়ে নেয়। বুকের ভিতরটা কাঁপছে। আঙুলগুলো কাঁপছে। এমন নয় যে আজ এই প্রথম চিঠি সে নীরদের কাছ থেকে পেয়েছে। অনেক চিঠি পেয়েছে এই তিনমাসে অনেক চিঠি সে নীরদকে লিখেছে। সবগুলোই যে প্রমাণ সাইজ চিঠি তা নয়। অধিকাংশই খবর পাঠানো খবর নেয়ার মতন এক কথা দু কথায় তাড়াতাড়ি করে লেখা এক টুকরো কাগজ। কখনো পেন্সিল দিয়ে কখনো কলম দিয়ে লেখা। 'কাল এত রাত হয়েছিল কেন?' 'আজ সকালে বৌদির সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হল।' 'একটু আগে আমি বারান্দায় গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার দেখা পাইনি—রান্নার তাড়া ছিল তাই অপেক্ষা করতে পারিনি।'—এই সব। চুরি করে লেখা চুরি করে দেওয়া চুরি করে পড়া এর প্রশ্ন ওর উত্তর। কিন্তু তার মধ্যেও উত্তেজনা কম থাকে না। আজ বড় চিঠি হবে ভাঁজ করা কাগজটা হাতে তুলে মালা টের পেল। তাই বুকটা যেন বেশি দুরদুর করছে। বিশেষ কাল রাত্রের সেসব কথার পর আজ সকালেই এই চিঠি। ভাঁজ খুলল। একটা দুটো তিনটে। আর এক ভাঁজ। সবটা চিঠি খোলা হয়ে গেলে পর মালা রুদ্ধশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করল। একবার পড়া হয়ে গেল। যেন কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। আবার পড়ল। এবার কথাগুলোর অর্থ কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সব পরিষ্কার হচ্ছে না। আর দাঁড়িয়ে নয়, আয়নার সামনে থেকে সরে এসে সে রমলার খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরল। বেশ কিছুটা সময় দিয়ে সে এবার সবটা পড়ে শেষ করল। এতক্ষণ মালার চোখের রঙ উজ্জ্বল কোমল স্বাভাবিক ছিল। চিঠির সব কথার অর্থ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলে উঠল। আঁচল দিয়ে মালা কপালের ঘাম মুছল। একটা মাছি বারবার ঘুরে ফিরে রমলার বাচ্চার মুখে এসে বসছিল। ঘাম মোছা আঁচলটা নেড়ে সে মাছিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। অবশ্য ভাল করে তাড়াতে তার হাত উঠছিল না। যেন হাতটা তার নিজের আয়ত্তের মধ্যে নেই। আপনা থেকে সেটা কখন স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। মেরুদাঁড়া টান করে বসে মালা বাঁ হাতে ধরা চিঠিটার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। চিঠির ভাঁজ খোলার সময় তার ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল। এখন নিশ্বাস মন্থর গাঢ়। দেখে হঠাৎ মনে হবে বুঝি বা নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। এটা বাইরের লক্ষণ। কিন্তু ভিতরে? বুকের ভিতর আগুনের ঝড় বইছিল তার। আর সেই আগুনে চিঠির প্রত্যেকটা যুক্তি সান্ত্বনা উপদেশ আশ্বাসকে পুড়িয়ে সে ছাই করে দিতে লাগল। কিন্তু সবগুলো কথা যেন পুড়েও পুড়ছিল না, শক্ত হাড়ের টুকরো হয়ে পাথরের টুকরো হয়ে ছোট ছোট ইস্পাতখণ্ড হয়ে আগুনের সঙ্গে যুঝছিল : 'হঠাৎ তোমার এতটা অস্থির হবার কারণ নেই। তুমি তো আর বিপদে পড়নি। বিপদ বলতে আমি কি বুঝি তুমি নিশ্চয় বুঝে থাকবে। সুতরাং আজই অস্থির না হয়ে চঞ্চল না হয়ে ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে আমাদের এগোতে হবে সব কিছু করতে হবে। একটা বড় প্রশ্ন তোমার স্বামী জীবিত। কোর্টে গিয়ে এই বিয়ে রদ করা যায়। অবশ্য তার হাঙ্গামা অনেক। তোমার স্বামীর এতে মত আছে কিনা, যদি না থাকে স্বামী তোমার ওপর অত্যাচার করে, তোমাকে খেতে পরতে দেয় না এসব প্রমাণ তথ্য সাক্ষীসাবুদ আদালতে উপস্থিত করতে হবে। এভাবে যদি বিয়ে রদ করা যায় তবে আর আমাদের দুজনের একত্র বাস করতে বাধা থাকে না। কিন্তু সেটা এখনই সম্ভব হচ্ছে কি। অনেক অসুবিধা। তুমি চিন্তা করে দেখ। তবে আর কি

উপায় আছে? তোমায় নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে আরও বিশ্রী। পুলিশ পিছনে লাগবে। চোরের মতন পালিয়ে কাঁদন থাকা যায়। তা ছাড়া কাজকর্ম না করলে খাওয়া পরাও তো চলবে না। বরং এখন এখানে আমরা যে ভাবে আছি সেইটে সবচেয়ে নিরাপদ। তোমার দাদা তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই যে সেকথা ভেবেও তুমি অস্থির হবে। সুতরাং আমার মনে হয়, সব এখন সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুজনের অপেক্ষা করা ভাল। কোনো অসুবিধা হবে না। কাজেই— বাস্তবিক কাল তোমার হাবভাব দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আমার কেবল ভয়, রাত্রে ঘুম হয়নি এই ভেবে, বুঝি তুমি বড় রকমের বিপদে পড়েছ।—

'ভীরু, কাপুরুষ!' মালা নিজের মনে বলল, 'আমি তেমন লেখাপড়া শিখিনি। কিন্তু শিক্ষিত মানুষ তোমার চিঠির এই নমুনা? এই ভাষা!' মালার শরীর মন ঘৃণায় কুঁচকে উঠল। টুকরো টুকরো করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল। বলল, 'আমার রাগ করার অভিমান করার গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরার এই অর্থ তুমি আবিষ্কার করলে। বুদ্ধিমান বটে!' অস্থির উত্তেজনায় মালা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর থেকে দেশলাই টেনে এনে চিঠির টুকরোগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। 'যাক, সব পুড়ে খাক হয়ে যাক। এসবের কোনো চিহ্ন আমি রাখতে চাইনে।' বলল আর স্থির অপলক চোখে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। মালার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। মোটা ধারায় চোখের জল ফেলে কান্না। কিন্তু তা না হলে কি। সব সময় তো চোখে জল আসে না। তার বুকের ভিতর কান্নার ঢল নেমেছে। তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে কাঁদছে : 'এই শর্ত সামনে রেখে তোমার ভালবাসা! বলো ভালবাসার খেলা। যতক্ষণ না তোমার সন্তান আমার গর্ভে আসছে ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত নির্বিকার স্বাধীন? বটে, আজ তোমার আইনের ভয় পুলিশের ভয়! কিন্তু যদি একদিন আমার সে রকম কোনো বিপদে পড়তে হয় সেদিন তুমি সব ভয় সব দুর্ভাবনা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব মাথায় পেতে নেবে কি? নেবে না তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে। না হলে তিনবার চিঠিতে সতর্ক সাবধান হুঁসিয়ার কথাটা লাগাচ্ছ কেন।' মালার চোখের ওপর থেকে একটা ঠুলি সরে গেল। এখন সে পরিষ্কার তার নিকট ও দূর ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছে। দেখছে নীরদকে— নীরদ নামধারী এক পুরুষের বিশ্বাসঘাতক মনকে। 'আইন—আইনের ভয়! সেদিন আমার গায়ে হাত দিয়েছিলে সেদিন আইনের কথা মনে ছিল না কাপুরুষ!' বলল মালা, বলতে বলতে সে রমলার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। তার পা টলছিল মাথা ঘুরছিল। কুঁজো থেকে ঘটিতে জল গড়িয়ে নিয়ে সে মাথায় ঢালতে লাগল। অনেকক্ষণ ঢালল। মাথাটা ঠান্ডা হয়েছে যখন বুঝতে পারল দরজা ছেড়ে সে কোনরকমে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। মাথাটা আঁচল দিয়েই মুছল। তারপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এবার চোখ বুজে মালা চিন্তা করতে লাগল। 'আমার ভুল—আমার ভুল হয়েছে, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার চিঠিতে তুমি সেকথা একবার স্বীকার করছ না তো। যে যা হবার হয়েছে, আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। এখানেই এর শেষ হোক। শেষ হওয়াই তো ভাল। এর পরিণাম যখন এমন ভয়ংকর তখন—হ্যাঁ, আমি বুঝিনি, আমার এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে আজ যা এত সুখের এত তৃপ্তির কাল তা বিষের মত ঠেকবে। সব মন্দ সব বিষ অমৃত হয়ে উঠবে মেনে নিয়ে আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি ডাক্তাররা যেমন নিজেদের শরীরে টিকা নিয়ে ইঞ্জেকসন নিয়ে বা রোগ না হতে পারে ওষুধপত্র খেয়ে পরে রুগী হাতাতে আসে তুমি সেভাবে সতর্ক হুঁসিয়ার হয়ে আমার কাছে

আস, এসেছ।' চিন্তা করে এবার মালার চোখের কোণা বেয়ে জল পড়তে লাগল। 'আজই আমি সন্তান হোক চাইছি না, হয়তো কখনো চাইতাম না। কিন্তু সেটা ভয়ংকর অবৈধ। এবং এটা কখনও ঘটবে না এই শর্ত, শুধু এই শর্ত সামনে রেখে যে-পুরুষ একটি মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নেয় সে কুৎসিত লম্পট পশু। তোমার চিঠি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। না হলে, এত সান্ত্বনা এত সাবধান বাণী শোনাবার পর আজ আবার লিখতে না, রাত বারোটার সময় প্যাসেজে থেকো। এটা খুব বৈধ কাজ হচ্ছে, কেমন?'

অনেকক্ষণ একভাবে নির্জীবের মতন পড়ে রইল মালা। বেলার মনে বেলা গড়িয়ে গেল। রান্নাঘরে বাড়া ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে আছে মনে পড়তেও উঠে গিয়ে খেতে ইচ্ছা করছিল না তার। ওধারে রাস্তার নিম গাছটায় পাখির কলরব শুরু হয়েছে যখন শুনতে পেল তখন সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর তখন মালার চেহারা যে দেখত সে ভয় পেত। সকালে স্নান করে চমৎকার খোঁপা বেঁধেছিল। তার আর কোন চিহ্ন এখন নেই। কপালে গালে গলায় পিঠে কালো কোঁকড়া চুলের রাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু চুপ করে নেই তারা। গলা বাড়িয়ে ফণা তুলে যেন হাজারটা কালো বিষধর সাপ অবিশ্রাম ফোঁস ফোঁস করছে। আর সেই সব ভয়াল ফণার মাঝখানে মালার চোখ দুটো জ্বলছে। শুধু দাহ না শুধু জ্বালা না, যে আগুন জেলে নারী জগত সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সেই ভয়ংকর আগুন সহস্র শিখা হয়ে মালার চোখে জ্বলছে। এত আগুন তার চোখে আছে মালা নিজেও যেন জানত না। দেয়ালে টাঙ্গানো ছোট আরশিটায় চোখ পড়তে ও চমকে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোকে ও শান্ত করল। যাক, এখনই তো আর সব আগুন সে কাজে লাগাচ্ছে না, ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখবে। বরং এখন আরশি থেকে চোখ সরিয়ে ও দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারে এ-মাসের একটা তারিখ খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল। আলপিনের সূক্ষ্ম আঁচড় বুলিয়ে তারিখটাকে সে নিজের হাতে চিহ্নিত করে রেখেছিল। তারিখ দেখা শেষ করে মালা নিজেকে দেখতে লাগল। নিজের আত্মা না মন না হৃদয় না। শুধু শরীর। কেবল শরীরের সঙ্গে যৌবনবতী নারীদেহের রক্তমাংস মেদমজ্জার সঙ্গে মাসের একটা তারিখের এত মিল এমন গূঢ় সম্পর্ক যেন নীরদের চিঠি পড়ার আগে মালার জানা ছিল না। জানা ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে এত উদ্বেগ এত দুশ্চিন্তা এত আতঙ্ক জড়িয়ে আছে মালা বুঝত না। এখন বুঝল। না, দুশ্চিন্তা আতঙ্ক মালার না একটি পুরুষের। নীরদের। ভাল ভাল। আলপিনের আঁচড় কাটা মাসের সেই বিশেষ তারিখ ও নিজের শরীর দেখে যখন ও শেষ করল তখন সাপের জিহ্বার মত চিকন একটা হাসি তার পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠের মাঝখানে চকিতে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। 'ভাল ভাল, তোমার আতঙ্ক দিয়ে আমি তোমাকে মারব। আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে তার তাপে তুমি হাত সেঁকবে পা সেঁকবে—না, আর একটু বেশি,—' কার সঙ্গে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় চিন্তা করতে করতে উপমাটা মালা আবিষ্কার করল : 'নরম পায়রার মাংস পাক করার মতন তাপ হলেই তোমার হয়, তার বেশি চাই না, মাংসটুকু উদরসাৎ করে নিটোল এক ঘুমে রাত শেষ করে দিয়ে পরদিন হৃষ্টমনে অফিস করতে যাবে। শুধু এই। শুধু এই? তুমি কি জান না মূর্খ সেই আগুন আমার হাড় পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে আমার আত্মাকে কালো করে ফেলছে।'

শিশুটা কেঁদে উঠল। মালা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। কলে জল এসে গেছে। আসুক। এই দেয়াল থেকে সেই দেয়াল পর্যন্ত মালা পায়চারি করছে। ঢিলেঢালা বসন। বিশ্রস্ত চুল। পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘিনীর মতন ক্ষোভে আক্রোশে সে ছটফট করছে।

এগারো

ঝুরেঝুরে করে বৃষ্টি নামল আর লোকটা ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল। সুধাংশু মনোযোগ দিয়ে একটা মেডিকেল জার্নাল পড়ছিল। অনেকক্ষণ থেকে দিনটা অন্ধকার হয়ে আছে বলে লালু ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মত আলো জেবলে দিয়েছে। লোকটা ভিতরে ঢুকতে সুধাংশু কাগজ থেকে চোখ তুলল। তৈলহীন রুক্ষ চুল শুকনো চেহারা এবং আগন্তুকের বেশভূষাও অত্যন্ত মলিন। সুধাংশু লক্ষ্য করল জুতোয় কাদার দাগ লেগে আছে। শহরতলী বা আশে পাশের কোন গ্রাম থেকে এসেছে হয়তো সুধাংশু অনুমান করল। বুক খোলা একটা কোট গায়ে। নীচের গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। ঘামে ময়লায় এমন রং ধরেছে যে দেখে আপনা থেকে সুধাংশুর নাক কুঁচকে গেল। কাপড়ের কোচাটা ঘুরিয়ে এনে কোটের পকেটে ঢুকিয়েছে। বাঁ হাতের আঙুলে একটা রুপোর আংটি। গ্রহ শান্তির জন্য এটা পরা আংটির মাথায় তেঁতুল বীচির রঙের পাথরটা দেখে সুধাংশু অনুমান করল। লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে সুধাংশুর টেবিলের পাশে চেয়ারের কাছে দাঁড়াতে সুধাংশু হাত তুলল, আঙুল দিয়ে ওধারের দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো বড় বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিল। 'ওপাশে বসুন।'

'কেন বলুন তো,' আগন্তুক সরাসরি সুধাংশুর চোখের দিকে তাকাল। 'আমি কি চেয়ারে বসতে পারি নে। আরে মশাই আমিও ভদ্দরলোকের ছেলে।'

কথা যেমনই হোক লোকটার গলার স্বরে এমন একটা ঔদ্ধত্য ছিল যে সুধাংশু অবাক হল ক্রুদ্ধ হল।

'ভদ্রলোক ছোটলোকের কথা হচ্ছে না। রুগীদের বসবার জায়গা ওটা,—এখানে না।'

এবার নাকের শব্দ করে লোকটা হাসল।

'আমি রুগী আপনি কি করে বুঝলেন?'

'আচ্ছা, আপনি রুগী না হন রুগীর জন্য ওষুধ নিতে এসেছেন এই তো? ঐ একই কথা, ওখানে বসুন।' সুধাংশু আঙুল দিয়ে আবার বেঞ্চিটা দেখাল।

কোটের পকেট থেকে ভয়ংকর অপরিচ্ছন্ন একটা রুমাল বার করে আগন্তুক কপাল মুছল। যেন রুমাল এখনি দুর্গন্ধ ছড়াবে অনুমান করে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সুধাংশু শক্ত হয়ে বসে রইল।

'মশাই, সাধে কি আর বলে আপনারা কলকাতার ডাক্তাররা জ্যান্ত মানুষকে ধরে ধরে মেরে ফেলেন। এক লিভারের পেইন ছাড়া চোদ্দ বছরের মধ্যে আমার কোনো রোগ হয়েছে বলে তো জানা নেই। বাড়িতে রুগী? তা বলতে পারেন। বুড়ো বাপ বাতে ভুগছে, ভুগছে মানে বিছানাই নিয়েছে আজ সাত বছর। কিন্তু বাবার জন্য কি আর আপনাদের মত পাশ করা ডাক্তারদের কাছে আসব ভেবেছেন? আরে মশাই মেডিকেল জগতের খবর টবর আমরাও এক আধটু রাখি। ওই কোবরেজী তেল। এ ছাড়া বাতের দাওয়াই কোনো চাঁদ ডাক্তার তো আজ পর্যন্ত বার করতে পারলো না। বলবেন ইঞ্জেকশন। আরে সে খবরও রাখি মশাই। ইঞ্জেকশনে ক ঘণ্টার জন্যে বাত সারে কাঁদন দাবিয়ে রাখতে পারে আপনি নিজে ডাক্তার হয়ে একবার বুকে হাত রেখে আমায় বলুন তো? বাতের হল গিয়ে তেল। চড়ক মুনি থেকে আরম্ভ করে আজকের আপনাদের চুনাপুকুরের চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার রাধারমণ চক্রবর্তী পর্যন্ত তেল মালিশের ব্যবস্থা দিচ্ছে। মিছা বলছি?'

'আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন।' যতটা সম্ভব সংযত থেকে গম্ভীর গলায় সুধাংশু

বলল, 'তা হলে কি চাই আপনার, কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে বরানগরের বাসিন্দা মশাই, চল্লিশের সি চিন্তামণি ঠাকুর লেন আমার ঠিকানা, গোপন করার কিছুই নেই। আমার নাম শ্রীমাণিক দাস। আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত প্রতাপ দাস।'

চুপ থেকে সুধাংশু টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল।

লুব্ধ চোখে টিনটার দিকে তাকিয়ে মাণিক দাস বলল, 'চুপ করে গেলেন কেন, আমার বংশ পেশা এসবও জিজ্ঞেস করুন, মনে করেছেন রাস্তার একটা যা-তা লোক আপনার ডিস্পেন্সারীতে এসে ঢুকল।'

এবার সুধাংশুর হাসি পেল।

'না না তা ভাবব কেন, তা ভাবিনি, মশাইয়ের এখানে দরকারটা কি জানতে দোষ আছে কিছু?'

'বলব বলছি!' অনুমতির অপেক্ষা না করে মাণিক দাস সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'আমরা কায়স্থ মশাই, নিজেও কিছু বেকার বাউণ্ডুলে নই। বরানগর ঊর্বশী সিনেমা হলের নাম শুনেছেন কিনা জানি না। আমি তার অপারেটার।'

'ভাল।' মৃদু শব্দ করে সুধাংশু সিগারেট টানতে লাগল। এবং এবারও দেখা গেল অনুমতির অপেক্ষা না করে মাণিক দাস টিন থেকে দীর্ঘ একটা সিগারেট তুলে নিল। অদূরে একটা কাঠের বাক্সের ওপর উপবিষ্ট সুধাংশুর বালক কর্মচারী লালমোহন কটমট করে মাণিক দাসকে দেখছিল। না বলে ডাক্তারবাবুর টিন থেকে লোকটাকে সিগারেট নিতে দেখে লালমোহন অস্ফুট শব্দ করে কি যেন বলল এবং মেরুদাঁড়া টান করে শক্ত হয়ে বসল। লালু চটে গেছে লক্ষ্য করে সুধাংশু মৃদু হাসল। মাণিক দাস এসব কিছুই লক্ষ্য করল না। সিগারেট ধরানো শেষ করে সুধাংশুর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের এটা চুরাশি নম্বরের বাড়ি তো?'

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

'দোতলা বাড়ি মনে হচ্ছে,' মাণিক দাস প্রশ্ন করল, 'ওপরে অন্য সব লোক ভাড়া নিয়ে আছে, কেমন তাই না?'

'তা আপনি কি ওপরের কোনো লোকের কাছে এসেছেন, না আমার কাছে আপনার দরকার? হ্যাঁ, ওপরে অন্য সব ভাড়াটে আছে।'

ডাক্তারকে হঠাৎ আবার বিরক্ত হয়ে উঠতে দেখে মাণিক দাস চমকে উঠল তার হাতের সিগারেট নড়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আহা রাগ করবেন না, রাগ করবেন না,—ওপরে প্রফুল্ল রায় আছে না? টি মার্চেণ্ট, বৌবাজারে দোকান?'

'হ্যাঁ, আছে।' সুধাংশু হাত দিয়ে তার ডান পাশের জানালাটা দেখাল। 'ওপরে যাবার রাস্তা ওদিক দিয়ে। বেরিয়ে চলে যান।'

'তা তো যাব মশাই, কি রকম জোরে জল হচ্ছে দেখছেন তো।' মাণিক চেয়ার ছেড়ে উঠবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে মনের সুখে সিগারেট টানতে লাগল। তখন প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি হচ্ছে। এক মিনিট চুপ থেকে পরে মাণিক দাস অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমি প্রফুল্ল রায়ের ভগ্নপতি,—হ্যাঁ, মালার স্বামী, এখন এখানেই আছে ও কিছুকাল, দেখেছেন কিনা জানি না।'

সুধাংশু হ্যাঁ না কিছু বলল না। কিন্তু ওপাশে লালু কাঠের বাক্স থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল আর যেন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে চোখমুখের এমন ভাব

করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : 'ও! মালাদির বর আপনি, মালাদির—' বলে ছুটে দরজার কাছে চলে গেল। যেন তখনি সে বেরিয়ে যেত জল দেখে থমকে দাঁড়াল।

'কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছিস।' সুধাংশু গম্ভীর গলায় ডাকল। 'এদিকে আয়।'

লালু যেমন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠেছিল তেমনি আবার হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলল। বস্তুত একটু সময়ের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল ডাক্তারবাবু এখানে বসে আছেন। তাকে দেখছেন। লোকটি মালার বর শোনা মাত্র সে ছুটে বেরিয়ে ওপরে খবর দিতে চলছিল। তার কারণ আছে। দুপুরের দিকে ডাক্তার যখন ডিস্পেন্সারীতে থাকে না তখন প্রায়ই মালা নীচে নেমে এখানে আসে। উদ্দেশ্য লালুকে দিয়ে আলুর চপটা চানাচুরটা কি দরকার মত সাবানটা তেলটা দোকান থেকে আনানো। সেই সূত্রে মালার সঙ্গে লালুর সম্পর্কটা বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। খাবার কিছু কিনে আনলে মালাদি তাকে ভাগ দেবেই। আর একটা কথা, মালাদির বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে না, এখানে দাদার বাসায় মাসের পর মাস কাটাচ্ছে একটু একটু বুঝতে পারার মতন সাবালক হয়েছে লালু। তা ছাড়া ডিস্পেন্সারীতে ঢুকে অধিকাংশ দিনই মুখ কালো করে মালাদি যে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে লালু লক্ষ্য করেছে। তাই আজ এখন মালার বরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব সুধাংশুর খুদে কর্মচারীটিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল ব্যস্ত করে তুলেছিল। দরজা থেকে সরে এসে লালু তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসতে সুধাংশু মাণিক দাসের দিকে চোখ ফেরাল।

'বৃষ্টি এখনি ধরবে, আপনি ওপরে গিয়ে খোঁজ নিন।'

'তা নেওয়া যাবে, আর খোঁজ নেবার আছে কি—চুরাশি নম্বরের বাড়ি আমি তো ঠিকানা জানি। এখন কথা হচ্ছে কি—' কি যেন বিড়বিড় করে পরে মাণিক প্রশ্ন করল, 'প্রফুল্লবাবু বাড়ি আছেন খবরটা দিতে পারেন কি? না কি দোকানে চলে গেছেন। আপনি যদি বাচ্চাটাকে একবার ওপরে পাঠিয়ে—'

উৎসাহে লালুর চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। কিন্তু ডাক্তারবাবুর চেহারায় সেরকম কোনো অনুমোদন না দেখে লালমোহন আসন ছেড়ে উঠতে পারল না।

মানিকের কথা শুনে সুধাংশু ঠোঁট বেঁকিয়ে ঈষৎ হাসল।

'আমার বাচ্চাকে আর পাঠিয়ে দরকার কি। আপনি যখন এবাড়ির জামাই সরাসরি ওপরে চলে যান, কে আপনাকে আটকাচ্ছে। এই তো বৃষ্টিটাও ধরল যেন।'

কিন্তু তাতে মানিকের উৎসাহ বাড়ল বলে মনে হল না। বৃষ্টি দেখতে দরজার দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে বরং সুধাংশুকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল আর জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল। যেন মানিক দাস ভাবনায় পড়েছে। লক্ষ্য করে সুধাংশুর মন্দ লাগছিল না। কেননা প্রফুল্ল রায়ের বোন সম্পর্কে দু একটা কথা তার কানে এসেছে। নীরদের ছেলেকে দেখতে তার রোজ একবার ওপরে যেতে হয়। প্যাসেজে কি দোতলার সিঁড়ির মুখে অথবা পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় মালাকে সে বহুবার দেখেছে। একদিন কথায় কথায় নীরদের ঝি হরির মার মুখে সুধাংশু জানতে পারল মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামী মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন ভাইয়ের সংসারে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই পর্যন্ত। স্বামী তাড়িয়ে দিল কেন, লোকটার স্বভাব চরিত্র কেমন বা মেয়েটির কিছু দোষ আছে কিনা ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই সুধাংশু আজ পর্যন্ত কাউকে করেনি। করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন বরানগরের মানিক দাসকে দেখে হরির মার কথা সুধাংশুর মনে পড়েছে। প্যাসেজে বা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মালাকে তার মনে পড়ল। মেয়েটি সুন্দরী।

'যান বৃষ্টি ধরে গেছে।' সুধাংশু এবার আর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'ডান দিকের প্যাসেজ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই ঘোরানো সিঁড়ি পাবেন। বাঁ দিকের ফ্ল্যাট।'

মানিক পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেলল।

'প্রফুল্ল রায় বাড়িতে না থাকলে আমার ওপরে যাওয়া চলবে না।' 'সে কি কথা, আপনি—' বলতে বলতে সুধাংশুও থেমে গেল।

'হ্যাঁ, এবাড়ির জামাই, আইনতঃ এখনো তাই আছি।' মানিক দাস ফ্যাকাশে একটুখানি হাসল। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ভাল নেই মশাই।'

'কেন' প্রশ্ন করতে সুধাংশুর রুচিতে বাধল। খুঁতখুতে মানুষ। চুপ করে রইল। কিন্তু মাণিক চুপ করে থাকতে পারল না। যেন ভিতরে অনেক ক্ষোভ আছে অভিযোগ আছে এমন ভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল, গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার করল, চেয়ারের পিঠে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় সোজা করে বসল; তারপর হাতের শীর্ণ শুকনো আঙুল দিয়ে টেবিলটা দুবার ঠুকে মাণিক নীরস গলায় বলল, 'মশাই কথায় আছে না যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। প্রফুল্লর বোনের অবস্থা হয়েছে তাই। না হলে বিয়ের পর ছ মাস না পেরোতে আমি ওর হাতের ছুরি গড়িয়ে দিলাম, একেবারে হাল প্যাটার্ণের ইলেকট্রিক চুড়ি, ছ গাছা—শাড়ি কিনে দিয়েছি তিন জোড়া—বাপ মা মরা মেয়ে, ভাইয়ের অবস্থা সুবিধের নয়, ঐ একরকম শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বোনকে পাত্রস্থ করা। বুঝতাম, বুঝে কষ্ট হত বলে আমি যখনই পেরেছি এটা ওটা গড়িয়ে দিয়েছি কিনে দিয়েছি। আর ও আমায় কি দিল? দুর্নাম, মিছে দুর্নাম। আমি মাতাল আমার অন্য মেয়েমানুষ আছে বাইরে—'

'দেখুন', সুধাংশু যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'এসব আমাকে বলে লাভ নেই। আমি ওদের কেউ নই। আপনাদের মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে আমার তা—বেশ তো, আপনার যা বলবার ওদের গিয়ে বুঝিয়ে বলুন। লালমোহন, ধুনো দে। সন্ধ্যা হল।' সুধাংশু হাত-ঘড়ি দেখল। এবং আর একটু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় ঘাড় ফিরিয়ে ওষুধের আলমারীটা দেখতে লাগল। লালমোহন উঠে ধুনো জ্বালাবার উদ্যোগ করতে লাগল। মাণিক দাস আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে, যেন অনেকটা নিজের মনে বকতে আরম্ভ করল : 'প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম বিয়ের প্রথম রাতেই বোঝা গেছে আমাকে ওর মনে ধরেনি। না হলে কি আর পুরুষ মানুষ বাইরে কি করল না করল তা নিয়ে ঘরের স্ত্রী অমন লম্ফঝম্ফ করে। আসলে আমাকেই ওর ভাল লাগে না। আর শালা আমি এটা দিয়ে ওটা জুগিয়ে হয়রাণ। তারপর তো একদিন রেগে-মেগে ঘরের আয়না ভেঙে কাচের গ্লাস ভেঙে রেডিওটা নষ্ট করে আমার সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিয়ে রিক্সা চেপে ভায়ের কাছে চলে এলো। কিন্তু তারপরও আমি চিঠি দিয়েছি ওর কাছে, ভায়ের কাছে—ভদ্রতার খাতিরে একটা উত্তর পর্যন্ত না—'

যখন মাণিক এসব বলছিল তখন বাইরে দরজায় একটা রিক্স এসে দাঁড়াল। চৌকাটে দাঁড়িয়ে ধুনো দিতে দিতে লালু প্রথম রিক্সা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ঢাকনা সরিয়ে দুজন গাড়ি থেকে নেমে লোকটার পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে। তখনও দু ফোঁটা এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ছে।

'ওপরের প্রফুল্লবাবু আর তাঁর স্ত্রী এসে গেছে।'

'তাই নাকি।' লালুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু অল্প হাসল, আর কিছু বলল না, মাণিক দাস নড়ে-চড়ে পিঠ খাড়া করে বসল।

'এই যে এখানে, ডিপেন্সারীতে মালাদির বর বসে আছে।' মাণিকের তরফ থেকে তেমন একটা সাড়া না পেয়ে লালু তৎক্ষণাৎ আবার দরজার কাছে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

'কে?' প্রফুল্লর স্ত্রী প্রশ্ন করল এবং থমকে দাঁড়াল।

'মালাদির বর, বরানগরের মাণিকবাবু।' লালু ফিক করে হেসে উঠল। রমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। প্রফুল্ল চৌকাটের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল।

'এই যে, শুনুন ইদিকে, আপনার ভগ্নীপতি এখানে আছেন।' সুধাংশু হাত তুলে ডাকল। 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

অগত্যা প্রফুল্লকে চৌকাট ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে হল। বেঁটে ছাতা ও ব্যাগ ঝুলিয়ে রমলাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল।

মাণিক ঘাড় সোজা করে প্রফুল্লকে দেখল। প্রফুল্ল ও রমলা আড়চোখে মাণিককে দেখল।

কিন্তু কোনো পক্ষই সাধারণ শিষ্টাচারটুকু জানাতে গ্রাহ্য করল না। সুধাংশু লক্ষ্য করল।

এক মিনিট সবাই চুপ।

তারপর মাণিক রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি মালাকে নিতে এসেছি।'

রমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি চুপ করে রইল। কথার উত্তর দিল প্রফুল্ল।

'মালা যাবে না।'

মাণিক দাস মাথা হেঁট করল।

যেন সব বলা হয়ে গেছে, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, রমলার হাত ধরে প্রফুল্ল দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'যাওয়া না যাওয়া কি ওর ইচ্ছে।' মাণিক ঘাড় তুলে বলল, 'আমি নিতে এসেছি সুতরাং আমার সঙ্গে যাবে, এখনি নিয়ে যেতে চাই।'

প্রফুল্ল মুখ না ফিরিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, 'আমার বোনকে তোমার নিয়ে যাবার কোনো রাইট্ নেই।'

শুনে মাণিক চমকে উঠল, উত্তেজিত হয়ে উঠল, লাফিয়ে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'আইনতঃ ওকে নিয়ে যাবার আমার অধিকার আছে,—আমার বিবাহিত স্ত্রী মালা।' উত্তেজনায় মাণিক দাস কাঁপছিল।

'বিবাহিত স্ত্রী!' প্রফুল্ল মুখ বিকৃত করল। 'মারধর করে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার সময় কথাটা মনে ছিল না বুঝি।'

'বেশ তো, আইনতঃ যদি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার অধিকার থাকে তবে সেভাবেই চেষ্টা করুন। আদালত থেকে হুকুমনামা নিয়ে আসুন। কিন্তু এখন আমরা যতদূর জানি মালা আর বরানগর ফিরে যাবে না, যেতে পারে না এবং তার অমতে আমরা তাকে আমাদের—' রমলা স্বামীর চোখের দিকে তাকাতে মাথা নেড়ে হাত নেড়ে প্রফুল্ল বলল, 'আমাদের কাস্টডি

থেকে ছেড়ে দিতে পারব না।'

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেন জানি এধারে উপবিষ্ট সুধাংশুর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে স্বামীর হাত ধরে রমলা চৌকাট পার হয়ে বাইরে নেমে গেল।

'দেখলেন, ছোটলোকদের কাণ্ডটা দেখলেন।' মাণিক ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সুধাংশু নীরব।

'আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে দিলে না, বললে না একবার ওপরে যেতে—' ঠোঁট দুটো কাঁপছে মাণিকের, কাঁদো-কাঁদো চেহারা।

কথা না বলে সুধাংশু হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলল। হাতের ঘড়ি দেখল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে সুধাংশু ঘাড় ফিরিয়ে লালমোহনকে দেখল। লালমোহন হা করে মাণিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এখন আমি কি করতে পারি, এ অবস্থায় আপনি আমাকে কি করতে অ্যাডভাইস দেন ডাক্তারবাবু, আপনি তো দেখলেন শুনলেন সব কথা?'

'আমি কি বলব, এ ব্যাপারে আমার কি বলবার আছে।' সুধাংশু গম্ভীর। 'আপনাদের পারিবারিক ঝগড়া।'

'না না।' মাণিক আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'প্রফুল্লর স্ত্রী কেমন মিলিটারী মেজাজ দেখিয়ে গেল—এ্যাঁ! উনি আমায় আদালত দেখাচ্ছেন হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন। কথা শুনলেন? না কি ছাতা ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেন বলে এমন মেজাজ দেখান কথায় কথায়—না কি ছাতা ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটে এমন কুড়ি দু-কুড়ি মেয়েছেলে আমি আমাদের বরানগরের রাস্তায় রোজ দু-বেলা দেখি না!'

সুধাংশু আর একবার হাতঘড়ি দেখল।

'আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। বাইরে একটা কল আছে।'

কাজেই মাণিক আর চেয়ার টেনে বসতে সাহস পেল না।

সুধাংশু ঘুরে দাঁড়িয়ে আলমারীর চাবি বন্ধ করে। লালমোহন এটা ওটা সরিয়ে গুছিয়ে রেখে জানালা বন্ধ করে।

যেন নিজের মনে কি একটা ভাবল মাণিক। তারপর প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলে মাথা ঝেঁকে বলল, 'আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কা'খানে কা'চাল হয়। এ্যাঁ, আইন দেখাচ্ছে, বৌ শ্বশুরের ভিটেয় যাবে না। বটে, আমার নাম মাণিক দাস। বরানগরে আমার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর তুই প্রফুল্ল আর তোর দু-পাতা ইংরেজী পড়া বৌয়ের ভয়ে আমি—আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে' বলে টলতে টলতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ননসেন্স, পাগল।' সুধাংশু বিড়বিড় করে উঠল। কিন্তু লালমোহন মুখ কালো করে কি যেন ভাবে।

বারো

প্রফুল্ল চুপ করে ছিল। রমলার মুখে মালা সব শুনল।

প্রফুল্লর ঘরে খাটের ওপর তিনজন গোল হয়ে বসেছে। কথা শেষ করে রমলা

রাউজের বোতাম খুলে ছেলের মুখে স্তন গুঁজে দেয়। প্রফুল্ল নতুন বিড়ি ধরায়। বাইরে আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের গায়ে কিসের একটা ছায়ার দিকে তাকিয়ে মালা একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর রমলার দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না, আমি ভাবছি, কোন লজ্জায় সে এখানে এলো, কোন সাহসে বলতে পারল আমি বৌকে নিতে এসেছি।'

'আমার ইচ্ছা করছিল ঘাড় ধরে হারামজাদাকে রাস্তায় নামিয়ে দিই।' প্রফুল্ল মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে নাকের একটা শব্দ করল। 'ওর চেহারা দেখেই তো আমার মাথার ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।'

'এমনিতে চালাক আছে।' রমলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'ঘাড়ে ধরে বার করে দেবে বলেই তো আর ওপরে ওঠেনি। ডাক্তারখানায় বসে ছিল।'

'আসতো একবার ওপরে।' রমলা গলার স্বর আগের চেয়েও কঠিন করল। 'আমি যা তা বলে ওকে অপমান করতাম, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতাম। আমি কিছুই ভুলিনি, এ-জীবনে ভুলব না।'

'দুশ্চরিত্র—হয়তো মদটদই খেয়ে এসেছিল। এসেছিল কোনো কাজে কলকাতায়। ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে এদিকে। মনে পড়েছে বৌয়ের কথা।' প্রফুল্ল একটুখানি হাসল।

'না তা নয়, তা হলে মুখে গন্ধটন্ধ থাকত,—আমি তো কোনো গন্ধ পাইনি, তুমি কি গন্ধ পেয়েছিলে?'

সুধাংশু মাথা নাড়ল।

'তবে আর কি।' রমলা বলল, 'এসেছিল মালাকে নিতেই। ভেবেছিল আমরা সব ভুলে-টুলে গেছি, ভেবেছিল আমরা আপত্তি করলেও মালা আপত্তি করবে না। হয়তো ভেবেছিল—'

'আমি আমার বোনকে খুব কষ্টে রেখেছি, খেতে পরতে দিই না। ছেঁড়া কাপড় পরছে আধপেটা খায়, ঝি হয়ে আছে এই সংসারে এই তো ভাবখানা?' প্রফুল্ল দাঁতে দাঁত ঘষল। 'কাজেই আমি গিয়ে দাঁড়াবা মাত্র আমার গলার আওয়াজ শোনা মাত্র মালা ছুটে আসবে কেঁদে-কেটে হাত ধরে বলবে যা হয়েছে হয়েছে, এইবেলা আমায় নিয়ে চল, আমি আর এক মিনিট এখানে থাকব না—এই তো?'

মালার দিকে আড়চোখে চেয়ে রমলা ক্ষীণ গলায় হাসল। কিন্তু মালা হাসল না।

'শত হোক আমার নিজের মায়ের পেটের বোন কথাটা যেন হারামজাদা চিরকাল মনে রাখে। আমি যদি শাক-ভাত খাই, আমার বোনও দুটি খেতে পারবে।' প্রফুল্ল পোড়া বিড়িতে আগুন দেয়।

'থাক দাদা তোমরা এইবেলা খেয়ে-টেয়ে শেষ কর, রাত হয়েছে।' মালা উঠে দাঁড়াল। 'যে অপদার্থ যে অমানুষ পশু তার সম্পর্কে কিছু বলতে কিছু শুনতেও আমার খারাপ লাগছে। বৌদি, ও ঘুমিয়েছে, রেখে তুমিও বসে পড়, আমি ভাত নিয়ে আসছি।' কুঁজো থেকে দু গ্লাশ জল গড়িয়ে পাশের টি-পয়ের ওপর রেখে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই বেলা রমলা ভাল করে স্বামীর দিকে ঘুরে বসল। প্রফুল্ল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল। মুহূর্তে রমলার চেহারা এমন বদলে যাবে সে ভাবতে পারেনি। 'কি বলছ?' অস্পষ্ট ব্যস্ত গলায় প্রফুল্ল স্ত্রীকে প্রশ্ন করতে রমলার চোখ দুটো আরো কঠিন হয়ে গেল নাক কুঁচকে উঠল। 'ঈশ্বর তোমার মাথায় একটা শিশুর বুদ্ধি দেয়নি।'

'কেন', ভীত আড়ষ্ট গলায় প্রফুল্ল আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন কি বলতে চাইছ।'

দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে রমলা যা বলার তাই বলল। 'কাল সকালের ডাকে একটা চিঠি ফেলে দাও মাণিকের কাছে। নিতে এসেছে নিয়ে যাক। আমি তো মনে মনে ধরে রেখেছিলাম শেষ পর্যন্ত তুমি রাজী হবে। না হয়ে করবে কি। মালা? তোমার মুখে 'না' শুনেই তো ও এত তেজ দেখাচ্ছে। সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু তুমি বাপু যতই বল প্রকৃতপক্ষে কার দোষ তুমি আমি বিচার করতে পারব না। কেউ পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি হয়েছে কি হয় বলা বড় শক্ত, বড় কঠিন। আজ তুমি অমত দিচ্ছ, কাল পরশু কি দুদিন পর এমন হতে পারে এই মালাই তোমাকে দোষারোপ করবে। স্বামী নিতে এসেছিল তুমি দাওনি। এখন ও-ও অবশ্য তোমার সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে, কিন্তু তখন তোমার কথাই কথা হয়ে থাকবে তোমার দোষই দোষ হয়ে থাকবে।' একটু চুপ থেকে রমলা বলল, 'মারধর করে—অনেক স্বামীই স্ত্রীকে মারধর করে। তাই বলে রাগ করে সবাই বাপের বাড়ি ভায়ের বাড়ি চলে আসে না। হ্যাঁ, যখন প্রাণের ভয় থাকে খুন করবে ভয় থাকে তখন—আর সেই সব স্বামী একদিনই স্ত্রীকে খুন করে, রোজ কিছু মারধর করে না। তার পরও যদি বুঝতাম তুমি বড়লোক, চিরকাল বোনকে ঘরে বসিয়ে খেতে পড়তে দিতে পারবে তবে না এই রাগের এই জেদের মানে হয়, কিন্তু কদিন তুমি এভাবে কষ্ট করবে আমি কষ্ট করব, আমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে তুমি কি চোখের ওপর দেখছ না, না চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে—না কি তুমি বলতে চাও—' রমলা থেমে গেল। মালা ভাত নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

'এর মধ্যেই ভাত বেড়ে নিয়ে এলে!' যেন একটু অবাক একটু বিরক্ত হতে গিয়েও রমলা তৎক্ষণাৎ তা গোপন করে চমৎকার বাঁকা ঠোঁটে হাসতে পারল। মালা কথা বলল না। ভাতের থালা নামিয়ে রাখল। ঘরে ঢুকেই এক সঙ্গে দাদা বৌদির মুখের ভাব লক্ষ্য করেছে সে, করে এর মধ্যেই একটা কিছু আঁচ করে নিয়েছে। ভাত রেখে তরকারীর বাটি আনতে আবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'নাও হাত ধুয়ে বসে যাও।' বাচ্চাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় রেখে রমলা সোজা হয়ে বসে। প্রফুল্ল ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীকে দেখে। এত সহজে গলার স্বর বদলাতে চেহারা পালটাতে রমলার জুড়ি এই পৃথিবীতে আছে কিনা অবাক হয়ে সে ভাবে। না কি সব মেয়েই এমন প্রফুল্ল তা-ও চিন্তা করে।

বিড়ালটা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। কোণার দিকে চাউলের ড্রামের পাশে বসে আছে বলে অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে। কিন্তু মালার চোখও কম জ্বলছে না। 'তুই কি এদিক দিয়ে পাল্লা দিয়ে আমার সঙ্গে পারবি? কত আগুন আছে তোর চোখে শুনি?' মালা নিজের মনে হেসে প্রশ্ন করল তারপর একটা ভাতের ডেলা বিড়ালটার দিকে ছুঁড়ে দিল। শুঁকল কিন্তু ভাত স্পর্শ করল না বিড়াল, মুখ তুলে কটমট করে মালাকে দেখতে লাগল। মাছ নেই। বুঝে মালা আর একটা ডেলা ছুঁড়ে দেয়। এবার আর খেতে আপত্তি নেই। মাছের টুকরো আছে ওই ভাতে। মাছ শুদ্ধ ভাত গিলে বিড়াল জিভ চাটতে থাকে আর গরর্ গরর্ শব্দ করে। 'আচ্ছা এটা দেখতো, এতে মাছ আছে কিনা।' আর একটা ডেলা ছুঁড়ে দেয় মালা। 'পুঁই চিংড়ির চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখেছি। মাছ কিছু অঢেল নেই তরকারীতে। একটা গরাসে আছে আর একটা গরাসে হয়তো কিছুই পড়েনি। এখন আমি

কি করে বুঝব কোন ডেলার মধ্যে মাছ লুকিয়ে আছে কোনটায় নেই? আমাদের এই রান্নাঘরের আলোরও তেজ নেই, পঁচিশ পাওয়ারের বাল্ব, তা-ও ধোঁয়ায় কালিতে কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস তো—নে, এটা শুঁকে দ্যাখ মাছ পাস কিনা।' আর একটা ডেলা মালা ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থেকে ভাবে, যেন বিড়ালকে ভাতের গরাস দিয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করছি, কোনটা ও খাবে কোনটা খাবে না। 'হ্যাঁ', কি 'না', মানে আমি এখানে থাকছি কি থাকছি না। এভাবে ভাগ্য পরীক্ষা করা ছাড়া আমার উপায় কি। দাদার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই সংসার তো আর দাদার ইচ্ছায় চলছে না। সংসারটা গিলে রেখেছে বাঘিনী রমলা। খেতে বসে তখন কানমন্ত্র দিয়েছে বাঘিনী দাদাকে। মাণিক যখন নিতে চাইছে মালাকে পাঠিয়ে দাও। এই সুযোগ। ভাত দিতে গিয়ে ওঘরে পা দিতেই তো আমি রমলার চেহারা দেখে বুঝে ফেলেছি। না হলে খাওয়ার পর দাদা আবার আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করবে কেন আমি ভাল করে কথাটা চিন্তা করে দেখেছি কিনা—স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, এখানে অন্য কেউ পরামর্শ দেবার নেই—নিজে যা ভাল বোঝ করবে। তা ছাড়া তা ছাড়া'—বিড়ি ধরাবার আছিলায় যে দাদা এরপর কি বলতে হবে ভাবতে শুরু করেছিল মালার বুঝতে কষ্ট হয়নি। তখনকার মত দাদাকে নিশ্চিন্ত করতে মালাকে বলতে হয়েছে, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু মালা জানে কাল সকালে তাকে আর ভাবতে দেবার সুযোগই দেওয়া হবে না। সারা রাত মন্ত্র পড়িয়ে পড়িয়ে দাদাকে রমলা এমন করে ফেলবে যে হয়তো সকালে উঠেই দাদা মালাকে ডেকে বলবে, 'আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, যা হবার হয়েছে,—মাণিক এসে একটা ভাল দিনটিন দেখে তোকে নিয়ে যাক।'

তার অর্থ সব ফুরিয়ে গেল সব নিভল।

তাই দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে মালা সরাসরি রান্নাঘরে ফিরে না এসে নিজের ঘরে গেছে। অপেক্ষা করেছে। রমলার ঘরের আলো যতক্ষণে না নেভে। আলো নিভতে ও খেতে এল। খেতে আসেনি ভাবতে এসেছে। ভাবছে আর পাতের ভাত ডেলা পাকিয়ে পাকিয়ে বিড়ালের সামনে ফেলে দিয়ে অদৃষ্ট পরীক্ষা করছে। 'আমি এখানে থাকব কি থাকব না।' একবার না দুবার না। থালায় যত ভাত বেড়ে নিয়েছিল সব ওদিকে ঠেলে ঠেলে দিয়ে পরীক্ষা করা শেষ হয়ে যেতে মালা হাত তুলে চুপ করে বসে রইল। কিছুই বোঝা গেল না। মাছের গন্ধ পেয়ে ষোল সতেরোটা ভাতের ডেলা বিড়াল গিলল বাকিগুলো সামনে পড়ে রইল। স্পর্শও করল না।

'না, আমার এখানে থাকা না থাকা নিয়ে এতবার যে পরীক্ষা করে দেখেছি তা দাদার মত না রমলার ইচ্ছা না বরানগরের মাণিক দাসের আবার একদিন ফিরে এসে আমায় নিয়ে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছার পরীক্ষা নয়। সে সব ইচ্ছার ওপর, কেবল এখানে আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় থাকা না, আমার বেঁচে থাকার,—আমার আমি হয়ে থাকার, আগের সেই মালা হয়ে থাকার সব আশা সব সম্ভাবনা আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি।' ভাবতে ভাবতে মালার চোখে জল এসে গেল।

ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল।

যেন কি কথা বলতে চাইছে ও, পারছে না।

কিন্তু না বলে উপায় কি।

একটু সময় চুপ থেকে বড় একটা ঢোক গিলে পরে সামনের কালি ঝুলে মাখা দেয়ালটাকে সম্বোধন করেই মালা আস্তে আস্তে বলল, 'খুব বেশি লেখাপড়া না শিখলেও আমি এটুকু

জানি মেয়েদের শরীর দেবতার মন্দিরের মতন। আমার মা আমাকে একথাই বার বার বলত। তখন আমি কুমারী। বলত, এই মন্দিরে কেবল একটি দেবতাই আসে, আসবে। কোনো মেয়ে যদি অনাছিষ্টি করে,—দেবতা আসবার আগেই শরীরকে অপবিত্র করে ফেলে তবে চিরকালের মতন সেই শরীর অপদেবতার ঠাঁই হয়ে থাকে। সেই মেয়ে নরকের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।' বড় ভয় পেত মালা। সারাটা কুমারী জীবন নরকের সেই অন্ধকার আতঙ্কের কথা ভেবে সাবধানে পা ফেলেছে, সতর্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়েছে। মা মরল। মালা কাঁদল। কাঁদল কিন্তু কুমারী জীবনের পবিত্রতা বাঁচিয়ে রাখার কথাটা একদিন এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনি—মা মরে যাওয়াতে কথাটা যেন আরো শক্ত হয়ে তার মনে গেঁথে রইল। তারপর একদিন দাদা বিয়ে দিল। বিয়ের রাত্রে মালার দুচোখ ছাপিয়ে জল এসেছিল। দুঃখে নয়, মা বেঁচে নেই বলে নয়, 'কে'দেছিলাম আনন্দে। দেবতা আসা পর্যন্ত দেহের শুচিতা মন্দিরের পবিত্রতা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা বজায় রাখতে পেরেছি, মার আদেশ মার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি এই তৃপ্তিতে এই সুখে।'

'কিন্তু তারপর? তারপর তো দেখলাম দেবতার রূপ। স্বামীর স্বরূপ। দুশ্চরিত্র মাতাল অত্যাচারী। অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু মনে জোর ছিল সেদিন, সান্ত্বনা ছিল, আমি শুদ্ধ আমি পবিত্র। আমার বেঁচে থাকার সুন্দর থাকার সম্ভাবনাগুলো আমার এই শরীরের মধ্যে আমার মনের এক জায়গায় ফুলের কলির বন্ধ পাপড়ির মতন জট বেঁধে আছে। ইচ্ছা করলেই এই ফুল ফোটাতে পারি। কিন্তু ইচ্ছা করি নি। ভাবতাম, কার জন্য ফুল?'

এবার মোটা ধারায় মালার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। কিন্তু তবু ফুল ফুটল। যেন এই ফোটার ওপর মালার হাত ছিল না। নিজের স্বভাবে একদিন ফুটে গেল। আর সেদিন মালা অবাক হয়ে দেখল, কেবল দেবতা না, কেবল স্বামী না,—পুরুষ, অন্য মানুষও নারীর জীবনে ফুল ফোটাতে পারে। আর সেই ফুলের গন্ধ সেই ফুলের রং বিভা দেবতার পায়ের ফুলের চেয়ে কিছু কম যায় না, বরং বেশি—বুঝি চার দেয়াল ঘেরা মন্দিরের বাইরে এ-ফুল রয়ে গেল বলে তার গায়ে হাওয়া লাগল বেশি আলো লাগল বেশি। তাই এত গন্ধ এত বর্ণ। কি, দেখে মালা নিজেই মাতাল হয়ে উঠল, উঠছিল। কাল নীরদের চিঠি পড়ে পাপড়িগুলো হঠাৎ কুঁকড়াতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, চিঠির ভাষায় সেই ঠাণ্ডা হাওয়া শীত আসছে তার সংকেত। কাপুরুষের আতঙ্ক।

তাই মালার চোখে জল।

'তাই আমি ভাবছি আমাকে নিয়ে এখন আমি কি করি।' জলভরা চোখ দুটো দেয়ালের দিকে মেলে ধরে মালা বলল, 'যদি কেউ বলে মাণিক অনুতপ্ত হয়ে আমাকে ফিরিয়ে নিতে এল, আর সে একদিনও আমার ওপর অত্যাচার করবে না, আমাকে যন্ত্রণা দেবে না তাহলেও কি আমার ফিরে যাবার উপায় আছে? মায়ের সংস্কার আমার রক্তের মধ্যে থেকে কলকল শব্দ করে বলছে তা হয় না, তা হয় না। একদিন সন্ধ্যাবেলা পাশের বাড়ির বাগান থেকে কিছু ফুল চুরি করে এনেছিলাম। ছুটে আসার সময় একটা ফুল নর্দমার ধারে পড়ে যায়। আর পড়ল তো পড়ল সবচেয়ে সুন্দর বড় গোলাপটা হাত থেকে পড়ে গেল। ওটার ওপর আমার বেশি লোভ তাই এদিক ওদিকে তাকিয়ে ফুলটা টুক করে তুলে নিলাম। আমি কি জানতাম জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা তখন আমাকে দেখছিল। ঘরে ঢুকে হেসে

বললাম : মা, দেখ, কত ভাল ভাল ফুল এনেছি তোমার ঠাকুরকে দেবে। গম্ভীর হয়ে মা মাথা নাড়ল : এ ফুল দেওয়া যাবে না। আমি কিছু প্রশ্ন করিনি। আমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে মা বলল : নর্দমার পাশে পড়ে গেল ফুলটা,—ওটা কুড়োতে গেলি কেন, সবগুলো ফুল নষ্ট করে দিলি। একটাও ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না। আজ আমার অবস্থা তাই। মাণিক অত্যাচারী মাতাল হতে পারে, কিন্তু যে-আগুন সাক্ষী রেখে ওকে স্বামী বলে স্বীকার করেছিলাম এখন যদি আমি আমার এই শরীর তাকে দিতে যাই তবে তো সেই আগুনকেই অপমান করা হল। তা কি করা যায় কখনো?

'তবে উপায়, এখন আমি কি করি!'

কান্নার ধমকে মালার শরীরটা নড়তে লাগল।

দূরে কোথায় একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। পাশের ঘরে রমলার বাচ্চাটা একটু কেঁদে উঠে আবার চুপ করে রইল।

'না, তা হয় না।' দাঁতে দাঁত ঘষে এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় নিজেকে শক্ত করে চোখ মুছতে মুছতে মালা উঠে দাঁড়ায়। 'নীরদ, নীরদ। ওকেই বলতে হবে। তোমার কোনো অধিকার নেই নিজেকে গুটিয়ে নেবার ভালমানুষ সাজবার ঠাণ্ডা নিশ্বাস ছড়িয়ে আমার পাপড়িগুলোকে নিস্তেজ হতম্লান করে দেবার। আমি তা হতে দেব না।

তেরো

শোবার ঘরে ঢুকে মালা শাদা শাড়ি ছেড়ে কালো শাড়ি পরল। তার রাত্রির পোশাক। অন্ধকারের সজ্জা। মালার হাত নাড়া কাপড় পরার ভঙ্গিতে এমন একটা কাঠিন্য এমন একটা ব্যস্ততা ফুটে উঠছিল দেখলে মনে হবে যেন যুদ্ধ করবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। চুল? হ্যাঁ, নতুন করে চুল বাঁধতে হবে বৈ কি। শক্ত করে খোঁপা বাঁধতে হবে। যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারি করতে গেলেও খোঁপা খুলে না যায়। নিজের ছোট্ট আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ইস! কী চেহারা হয়েছে এই একটা দিনে! মালার বুকের ভিতর তিরতির করে উঠল। শত কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও একবার দুবার ও মুখে একটু ক্রিম স্নো মাখে, চোখে কাজল বুলায়। আজ সে-সব কিছুই হয় নি। কিন্তু কিছু না করার কোনো অর্থ হয় কি? 'কারোর জন্য না কারোর জন্য না।' মালা বিড়বিড় করে উঠল। 'আমি আমার নিজের জন্য সাজব, নিজেকে দেখব।' রাজহংসীর মত গলা বাড়িয়ে দিয়ে আয়নার ওপরে বসানো ছোট কাঠের র‍্যাক থেকে টেনে টেনে কাজললতা, পাউডার স্নো-র কৌটো নামাল ও। আলতার শিশিটা নামাল।

'তুমি যা-ই বল, আমি ধরে ফেলেছি তুমি এখন কেটে পড়তে চাইছ সরে যেতে চাইছ,—কি? তুমি মাথা নাড়লে হবে কি, তোমার চোখ বলছে, তোমার গলার স্বর বলছে তুমি ভয় পেয়েছ। পুরুষ কতক্ষণ পুরুষ থাকে মেয়ে হয়ে আমি যদি তা না বুঝলাম আমার জন্ম বৃথা। এটুকু বুঝতে বেশি লেখাপড়া জানার দরকার হয় না। না, না, তুমি যা-ই বল, আমি অত্যন্ত সরল মেয়ে। সরলভাবে আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়েছি। মেয়েদের সর্বস্ব বলতে কি বোঝায় তা নিশ্চয় জান। আমার আর কে আছে, আমার কি কেউ আছে,—না এরপর থাকা উচিত? কাজেই চল কোথাও দুজনে পালিয়ে যাই—বাবু থাকবে, বাবুকে

আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসব তুমি দেখবে। চাকরি? পুরুষের কাজের অভাব হয় না। আমিও খাটব। তেমন লেখাপড়া যখন জানি না, গায়ে খেটে যা-হোক দুটো পয়সা রোজগার করে তোমাকে সাহায্য করতে পারব। তুমি প্রথম যেদিন আমাকে চিঠি লিখেছিলে বলেছিলে একমাত্র ভালবাসাই মানুষের জীবনকে সুন্দর সুখী করতে পারে, টাকাপয়সা ঘরবাড়ি কিছু না। আজ সে কথা—'

মালার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

বৌদি জেগেছে কি? দাদার গলা শোনা যায়? এত রাত্রে মালা ঘরে আলো জেলে জেগে বসে আছে টের পেয়ে ওরা ওঘরে আলো জ্বাললে কি। বুঝতে পারল না ও, বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে চট করে এ ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে কতক্ষণ স্থির হয়ে কান খাড়া রেখে পরে ও নিশ্চিন্ত হয়। না, ওদের কেউ জেগে নেই, ওঘরে আলো ননেই। নিশ্চিন্ত হলেও সে আর এখানে আলো জ্বাললল না। স্নো আলতা কাজললতা যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। মনে নেই,—মন ছিল না প্রসাধনে। সাধ অসাধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা—প্রসাধন তো তুচ্ছ, যেন বাঁচা মরার স্বপ্ন সাধ রুচি বিতৃষ্ণাগুলো এক একটা তরঙ্গ হয়ে তার মনের তটে এসে আছড়ে পড়ে আবার সেই মুহূর্তে ভেঙে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, এভাবে সোজা-সুজি নীরদকে সে বলতে পারবে কি? 'বরানগরের সেই মাতালটা আজ এসেছিল। আমি বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল বাইরে নীচে ফুটপাথের ওপর। মাতালটা এদিকে তাকাচ্ছে, যেন এ বাড়ির নম্বর দেখছে। আমি তো দেখেই চিনে ফেললাম। চিনতে পেরে রাগে ঘেন্নায় আমার মনের তখন কী অবস্থা! মানুষ ত না, কুকুর—পশুর মতন মনে হচ্ছিল লোকটাকে। স্বভাবের কথা বলছি না, স্বভাব যা আমার জানা আছে, কিন্তু অনেকদিন পর দেখার পরও বন্য জন্তুর কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। নাক চোখ কপাল ঘাড় পিঠের কী শ্রী! আর সেই সঙ্গে তখন মনে পড়ল তোমাকে,—তোমার মুখ তোমার চোখ তোমার চুল তোমার কপাল। সত্যি, তুমি কত সুন্দর। পুরুষ এত সুন্দর আমি কম দেখেছি। বাড়িয়ে বলছি? তা তুমি বলতে পার। কিন্তু এটা তো সত্য আমার চোখে যদি তোমাকে সুন্দর—পৃথিবীর সব পুরুষের চেয়েও সুন্দর লাগে তো তাতে কারওর কিছু বলবার নেই। কাকে কার চোখে সুন্দর লাগবে কি লাগবে না বাইরে থেকে অন্য লোকে তা বলে দিতে পারে না, পারা উচিত না। তাই বলছিলাম, আমার চোখে তুমি রাজপুত্তুর—দেবতা। হ্যাঁ, মাতাল এসেছিল আমাকে নিতে। তার উত্তরে আমি কি বলতে পারি বল তো?'

নীরদের সঙ্গে মনে মনে কথা বলা বন্ধ করে মালা একটু ভাবে। বলবে কি দাদার ইচ্ছা আছে বৌদির ইচ্ছা আছে কিন্তু তার নিজের একেবারেই ইচ্ছা নেই? যেন কথাটায় তেমন জোর থাকে না। দাদা বৌদিকে এখানে টেনে এনে লাভ নেই। যেন মাণিকের সঙ্গে মালার সোজাসুজি কথা হয়েছে। হ্যাঁ, একটু বাড়িয়ে বলতে হবে বৈকি নীরদকে। দুর্বলকে সবল করতে হলে একটু মিথ্যা করে কিছুটা বেশি করে বলা দরকার। বলবে, 'আমি তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছি, যেমন আমায় সে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর একথাও জানিয়ে দিয়েছি, জোর করে এখান থেকে আমায় নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। হয়তো জোর করলে সে আমার শরীর পেতে পারে কিন্তু মন? আমি যে আর একজনকে আমার শরীর মন দুটোই দিয়ে দিয়েছি। তাই

নয় কি? তুমি কথাটা ভেবে দেখ নীরদ। আমার শরীর ও আত্মা তোমার কাছে বাঁধা পড়েছে। হ্যাঁ, জানি যদি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই লোকে আমাকে কুলটা বলবে। বলবে মালা চরিত্রহীন নষ্ট মেয়ে। কিন্তু সেটা লোকের কাছে, আমার দাদার কাছে বৌদির কাছে বরানগরের মাণিক দাসের কাছে অথবা পাড়ার আর পাঁচটা লোকের কাছে। কিন্তু তোমার কাছে? তোমার চোখে আমি সুন্দর চিরকাল সুন্দর থাকব। তুমি কি আগে আগে চিঠিতে আমাকে গন্ধরাজ বলে ডাকতে না? বলতে গন্ধরাজ ফুলটি দেখতে যেমন বড়সড় পরিচ্ছন্ন তেমনি আমিও—অর্থাৎ আমার স্বাস্থ্য ভাল রং ফরশা। বলতে নাকি গন্ধরাজের গন্ধ যেমন মানুষকে পাগল করে আচ্ছন্ন করে তেমনি আমি, আমার শরীরের গন্ধ তোমাকে অস্থির করে উন্মাদ করে তোলে। কাজেই মাণিককে যখন আজ মুখের ওপর বলতে পারলাম আমি যাব না তার সঙ্গে তখন সব কথা কি বলা হল না সব সম্পর্ক কি শেষ হল না সেখানে। কাজেই—'

পারবে সে এভাবে নীরদকে বলতে?

মালা ভাবতে লাগল। এভাবে বললে নীরদের মনে সাহস ফিরে আসবে উত্তেজনা আসবে কি? অস্বস্তির কাঁটা মালার বুকের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। যেন এত সব বললেও ভীরু নীরদের সাহস আসবে না, মালার মন বলতে লাগল। বলতে লাগল আর আস্তে আস্তে তার সব শরীর কেমন অবশ নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। কাঁদতে আরম্ভ করল ও। 'কাপুরুষ কাপুরুষ, নিজে দুর্বল হয়ে আমাকে পর্যন্ত দুর্বল করে দিচ্ছে, ওর ভয়ের ছোঁয়াচ আমার মনে লাগতে শুরু করেছে, আমাকে ভয়ে ভাবনায় ভরিয়ে তুলছে, এখন আমি কি করি কি করি!'

শীতের রুক্ষ হাওয়া লেগে গাছের শুকনো পাতা যেমন কাঁপতে থাকে তেমনি এই অন্ধকার ঘরে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বুকে নিয়ে কান্নার ধমকে ও থরথর করে কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে কাটল। তারপর এক সময় ওপাশের দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে ও যখন রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিল বাইরের সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে কিছুটা শান্তি পেল। সত্যি বাইরে রাত্রির চেহারা তখন অপরূপ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। এলোমেলো হাওয়া আর মেঘে মেঘে আকাশের কী বিশ্রী চেহারা ধরেছিল! এখন সে সব কিছুই নেই। না একটু বাতাস না মেঘের ছিটেফোঁটা চিহ্ন কোথাও। শান্ত স্তব্ধ নীল আকাশের মাঝখানে রুপোর ডিমের মত এক চাঁদ চুপ করে তাকিয়ে হাসছে। আর সেই হাসি আকাশ চুঁইয়ে নীল সুধার মতন পৃথিবীর ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। রাস্তার এ পাশে গাছের পাতাগুলো নীল হয়ে গেছে রাস্তার ওধারের বাড়িগুলো নীল হয়ে আছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল মালার। নীল অপরাজিতা ফোটা মেঘমলিন সন্ধ্যা দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝরাতে কোনোদিন ঘুম ভেঙে গেলে মার সঙ্গে বাইরে ঘরের পৈঠায় পা দিয়ে চমকে উঠত। এক ফোঁটা মেঘ নেই। সারা আকাশ সারা পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরে আছে। এ সেই আশ্চর্য স্বচ্ছ কোমল নীলাভ রাত্রি। নিশ্বাস বন্ধ করে মালা কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখল। তারপর তার মনে পড়ল এই রাত আর সেই রাতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

সেদিন কি ছিল আজ কি নেই মালা আর তা ভাবল না। অনেক ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেদিন দূর গাঁয়ের এক খড়ের ঘরে মার বুক ঘেঁসে শুয়ে থাকা ফুলের মতন পবিত্র একটি মেয়ে এখন, আজ এই বর্ষণক্ষান্ত জ্যোৎস্না ধোয়া নীল রাত্রি সামনে নিয়ে নিজের অদৃষ্ট ভাবছে ভবিষ্যৎ ভাবছে। তাই কি? তা নয় তা নয়।

ভবিষ্যৎ আর অদৃষ্ট ভেবে ঠিক করার মতন মনের অবস্থা তার নেই। বরং—

যেন রাতটা হঠাৎ বড় বেশি শান্ত সুন্দর হয়েছে বলে মালার মন এতটা শান্ত হয়ে গেল। বুকের ভিতর আর আলোড়ন নেই। স্থির ঠাণ্ডা। যেন একটু বেশি শক্ত। না কি ইস্পাতের মতো ও কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই একটু সময়ের মধ্যে। কি হল! হঠাৎ এত শক্ত শান্ত হবার তো কথা না। মালা নিজেও বুঝতে পারেনা। বুঝতে পারল মনের গভীর অন্ধকারের এলোমেলো চঞ্চল ধোঁয়াটে চিন্তাটা যখন আস্তে আস্তে দানা বেঁধে কুটিল ভয়াল রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে ফণা তুলে ধরল। ছোবল মারার আগে সেই ভয়ংকর হিংস্র সতর্ক স্থির মুহূর্ত। যেন এই জন্যই আপাদমস্তক কঠিন হয়ে মালা দাঁড়িয়ে আছে। যেন স্তব্ধ সুন্দর অগাধ নীল রাত্রির সবটা বিষ শুষে শুষে নিয়ে নিজেকে ও নীল বিষাক্ত করছে।

পারবে। পারবে না? খুব পারবে। যে কোনো এক দুপুরে হরির মা একটু এদিক ওদিক সরে গেলে মালা ওঘরে ঢুকে কাজটা সেরে আসতে পারবে। গায়ের জোর? তার দরকার হয় না। মালার বাঁ-হাতের দুটো আঙুলের চাপ যথেষ্ট। ব্যারামে ভুগে ভুগে গলাটা শালিকের গলার মতো নরম লিকলিকে হয়ে আছে। একটুখানি চাপ। এক মিনিট দু মিনিট। তার বেশি সময় লাগবে না। তারপর মালা চলে আসবে নিজের ঘরে। তারপর—

হ্যাঁ, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নীরদ এখন যে কুটোটার মায়ায় (ছেলের কথা চিন্তা করে নীরদ আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না মালা বোঝে) আগুন নেভাতে চাইছে সরে পড়তে চাইছে বাঁচতে চাইছে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখবে সেই কুটো শেষ হয়ে গেছে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তা না হলে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল কি। ভালবাসার খেলায় মালাকে যেমন চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছে নীরদকেও দিতে হবে বৈ কি!

পারবে। পারবে না মালা? কথাটা ভেবে গলার কাছটা হঠাৎ তার কেমন ধক্ করে উঠল। কোথায় সে পারে! কতদিন তো মাথায় খুন চেপে যায় তার। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দু হাতের আঙুলগুলোকে আকসীর মতো বাঁকা করে রমলার বাচ্চাটার গলার কাছে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কঠিন হাত শিথিল হয়ে গেছে। বাঁকা আঙুল সোজা হয়ে গেছে এক সময়। পারে নি। আর না পেরে রমলার বাচ্চাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করেছে গালে কপালে চুমো খেয়েছে আর ছলছল চোখে ছোট্ট মুখখানা বারবার দেখেছে।

এখন তাই হল। নীরদের ছেলের বেলায়ও তাই হবে মালার মনে হল। আর মনে হতেই দু চোখ ছলছল করে উঠল। কিছু হল না। কিছু হবে না। নীল রাত্রির এত বিষ বুকে পুরে নিয়েও ও কিনা পাশের ঘরের রোগা ছেলের শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখখানা মনে করে কাঁদতে লাগল।

'কি হবে! তবে আমি কি করব! এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে আমাকে পথ বাতলে দেবার পরামর্শ দেবার কে আছে! ঈশ্বর ঈশ্বর!'

বিছানায় এলিয়ে পড়ে আবার ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ও। তারপর এক সময় দূরে পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনে আস্তে আস্তে উঠে চোখ মুছল।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'না।'

'কাঁদছিলে মনে হয়? আজ আবার কাঁদছ!'

'হ্যাঁ।'

'কেন।'

'তুমি—আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না।'

নীরদকে একটা বড় ঢোক গিলতে শোনা গেল।

'কি হয়েছে, এরকম করছ কেন, মালা!'

মালা নিরুত্তর। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদে।

'এই শোন, ছি,—কী ছেলেমানুষী করছ?'

নীরদ এবার ওর মাথায় হাত রাখল। মালা মাথা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল না। সাহস পেয়ে নীরদ ওকে বুকের কাছে টেনে নিল। হাত সরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি বড়ো অস্থির—বড়ো অশান্ত।'

'কি করে শান্ত থাকব!'

নীরদ হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। চুপ থেকে উত্তর খোঁজে।

'এ অবস্থায় কেউ শান্ত থাকতে পারে, স্থির থাকতে পারে! পুরুষ পারে। মেয়েরা পারে না। আমি পারছি না। তুমি—'

'আমি তো চিঠিতে সব বলেছি, এখনি—'

'আমি সাহস পাই না, আমার আর দেরি করতে ভয় হয়।'

'কেন!'

'তুমি যদি এখন সাহস না পাও ভবিষ্যতে সাহস পাবে তার ঠিক কি। সেই ভেবে আমার ভয় করছে।'

'কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি। আরে আমি তো আছি-ই—কথা বোঝ না কেন।'

'না না না, আর একদিন না, আজই চল, কাল চল কোথাও দুজনে সরে যাই।' নীরদের গলায় হাত রাখল মালা।

'আশ্চর্য!' অস্ফুট শব্দ করে নীরদ থেমে গেল।

'কি, বলো!' নীরদের গলায় মৃদু ঝাঁকুনি দিল মালা।

'চিঠিতে এত করে সব ভেঙে বুঝিয়ে বললাম—'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা।' মালা হাত নামিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। 'তবে আগে এসব কথা আমাকে বোঝাও নি কেন, প্রথম দিন প্রথম রাত্রে!'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' নীরদ উত্তেজিত হতে গিয়ে আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে রইল। 'এখনি তোমায় নিয়ে কোথাও সরে পড়ার বিপদগুলো তোমার মাথায় আসছে না?'

'না না না।' ঝড়ের মত ফুঁসিয়ে উঠল মালা। 'আমার মাথায় আর কিছু আসছে না। আমি এখন জানি শুধু তোমাকে। আমি চাইছি তুমি যত শীগগীর হয় আমায় নিয়ে ঘর বাঁধো।' একটু থেমে মালা বলল, 'এ ছাড়া আর কোনো পথ আছে আমার জানা নেই।'

'তবে কি—' কেমন যেন আঁৎকে উঠতে গিয়েও নীরদ হঠাৎ থেমে থেকে গম্ভীরভাবে মালার চোখ দুটো দেখে আরও নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে কপালে চুমু খায় আর অল্প অল্প হাসে। 'বুঝেছি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না বলে ভয় লাগছে তোমার।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না, কথা হচ্ছে এভাবে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।' মালা

আবার হাত দুটো নীরদের কাঁধের ওপর তুলে দিল। 'আমার কেন জানি কেবল মনে হচ্ছে এভাবে চুরি করে রাত্রে রাত্রে তোমার কাছে আসার কোনো মানে হয় না। এটা নোংরামী। এর নাম পাপ। আমরা পাপ করছি। আর এই পাপের ফলে আমরা বিপদে পড়ব। দুজনেই পড়ব। আমি তুমি। তার চেয়ে চলো দূরে কোথাও সরে গিয়ে একত্র থাকি। যেখানে পাপ নেই। সেটা সুন্দর সেটা ধর্ম। দুজনের নতুন জীবন দেখে নতুন ঘর দেখে ঈশ্বর সুখী হবে। আর আমরা বিপদে পড়ব না, কোনোদিন পড়ব না—তুমি দেখো।'

'বুঝি, আমি সব বুঝতে পারছি, তুমি যখন সেভাবে থাকতে চাইছ তোমার মন যখন চাইছে তখন নিশ্চয় একদিন সেভাবে থাকবে। সত্যিকারের চাওয়ার, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ সব পায়। তার ইচ্ছা ভগবান পূরণ করে। কিন্তু ঠিক এক দুদিনের ভেতর তো তা সম্ভব না—আর শোন একটা কথা, যে-কথা প্রথমেই তোমায় বলব বলে ভেবে রেখেছিলাম,—নীচে ডাক্তারখানায় শুনলাম লালু মহারাজের কাছে তোমার স্বামী নাকি আজ এসেছিল, তোমাকে বরানগর নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'হ্যাঁ।' নীরদের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে মালা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'তোমার দাদা বৌদি নাকি মাণিকবাবুকে অপমান করেছে?'

'তা আমি শুনিনি, তবে তাদের কারওর ইচ্ছা নেই আমি বরানগর ফিরে যাই।' মালা গলার স্বর কঠিন করল। 'সেখানে আর আমার যাওয়া হয় না।'

'কেন?' একটু থমকে থেকে নীরদ আস্তে আস্তে বলল, 'আসলে তো সে তোমার স্বামী। নিজে থেকে যখন ভদ্রলোক—'

'তা হলেও আমার ফিরে যাওয়া হয় না, এখন আর হয় না।' এখন কথাটার ওপর মালা বড় বেশি জোর দিল।

'কেন?' মৃদু হাসল নীরদ। 'যা-ই করুক, আবার যখন নিজে থেকে নিতে চাইছে—'

'আশ্চর্য!' অস্ফুট একটা শব্দ করে মালা থেমে গেল।

'না আমি বলছিলাম কি,—প্রথমটায় শুনে অবশ্য আমারও ইচ্ছে ছিল না তুমি সেখানে ফিরে যাও, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা ভুল হবে। আমি বলছি কি তুমি যাও এখন, দিনকতক গিয়ে থাক বরানগর,—ঝগড়াঝাটি রাগারাগি তা হবেই, লোক যখন সুবিধের নয়,—আবার চলে আসবে দাদার বাসায়। আমি তো রইলামই।'

মালার পা দুটো কাঁপছিল ঠোঁট কাঁপছিল। কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না। নীরদের কথা শুনে যায়।

'এটাই সবচেয়ে নিরাপদ, বুঝলে না? কি, যদি দরকার হয় সুবিধা বুঝি এখানকার ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি না হয় তোমাদের বরানগরে গিয়ে থাকব। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনো ঘরটর নিশ্চয়ই ভাড়া পাওয়া যাবে। তলে তলে তুমিও খোঁজ করবে। আমি—আমার কোনো অসুবিধা হবে না বরানগর থেকে এসে অফিস করার। আরো কত শত মাইল দূরে থেকেও লোকে কলকাতায় এসে রোজ অফিস কাছারী করে।—না, বলছিলাম কি এর চেয়ে আর ভাল কিছু ব্যবস্থা হতে পারে না। হ্যাঁ, লোকেও কিছু টের পেল না। ওদিকে তোমারও স্বামী সংসার সব বজায় রইল, অথচ আমাদের—আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝেছ।'

'উঃ!' যেন বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করল মালা। '—তুমি এত নিষ্ঠুর তুমি এত পাষণ্ড এত নীচ!' বলতে চাইল ও কিন্তু পারল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে রইল।

'কি, বলো?' নীরদ ওর বুকের ওপর হাত রাখল।

মালা হাত সরাল না। যেন পাথরের মতো স্থির অনড় ও। পা দুটো কাঁপছে না আর। বুকের স্পন্দন থেমে আছে।

'কি!' বিরক্ত হল নীরদ। 'তোমরা মেয়েরা ভয়ংকর সেণ্টিমেণ্টাল মানে এত নরম মন! আমি বুঝতে পারছি লোকটার কাছে তোমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না, হওয়া উচিত না,—আমাদের দুজনের ভালবাসা প্রেমের গভীরতাই অবশ্য এর কারণ। কিন্তু তা হলেও করা কি। অবস্থা বুঝে কাজ করতে হবে সময় বুঝে চলতে হবে। তুমি তো আর ওকে ভালবাসতে যাচ্ছ না, যেতে হচ্ছে সামাজিকতা রাখতে সমাজের মুখ রাখতে—'

বাধা দিল মালা। আর বাষ্প নেই আবেগ নেই—কুণ্ঠা জড়তা সব মুছে ফেলে প্রখর পরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আমি কি আবার স্বামীর ঘর করব বলে তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলাম। না, এর পর কোনো মেয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে! আমি পারব না, জেনে শুনে অত বড় পাপ কাজ অধর্মের কাজ আমার দ্বারা হবে না। ছিঃ এ সব তুমি আজ কি বলছ!'

'কী মুশকিল!' চাপা গর্জন শোনা গেল নীরদের গলায়। 'যত সব বাজে সেণ্টিমেণ্ট! সংস্কার। পাপ অপাপ ধর্ম অধর্ম—এসব হল মনের কাছে। মনে করলেই পাপ, মনে না করলেই পুণ্যি।' একবার থামল নীরদ তারপর যেন উত্তেজিত হবে না সংযম হারাবে না মনে পড়তে অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেন, তোমার শরীরটা কি পচে গেছে না ক্ষয়ে গেছে কোনোখানে যে স্বামীর কাছে যেতে মনের সায় পাচ্ছ না—অধর্ম! অশিক্ষিত মেয়েরা এ ধরনের কথা বলে।'

'তুমি চুপ কর, তুমি চুপ কর।' রুদ্ধ গর্জন করতে গিয়ে মালা দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। আর দাঁড়াল না।

'এই—' সাপের মতো হিসহিস করে উঠল, নীরদ। 'এই শোন—'

মালা শুনল না। ওঘরের দেয়ালের অন্ধকারে চট করে মিশে গেল। ছিটকিনি তোলার 'কটাস' শব্দটা নীরদ শুনল ঠিক।

হল না, কিছুই হল না। ব্যর্থ ব্যর্থ! অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ঘরের আলো জেবলে দেয় মালা। তাতে কি! অমাবস্যার অন্ধকার তার দু চোখে এসে বাসা বেঁধেছে। আলোতেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সীতা তো! কানেও তো কিছু শুনতে পাচ্ছে না ও। দেয়ালে টিকটিকিটা শব্দ করে, পাশের ঘরে বৌদির বাচ্চা কেঁদে ওঠে, রমলার, দাদার ঘুমের লম্বা লম্বা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দগুলো এঘরে ভেসে আসে। এখন যে কিছুই তার কানে আসছে না। যেন হঠাৎ এক পাতালপুরীতে নেমে এল ও। কি হবে কি হবে! মালার ভয় করতে লাগল। জিভটা বিস্বাদ ঠেকছে। কেবল বিস্বাদ না, পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে জড় হয়ে পড়ে আছে মুখের ভিতর ইচ্ছা করলেও মালা এখন সেটা নেড়ে একটা কথা বলতে পারবে না। কাঁদতে চেষ্টা করল কিন্তু চোখের জল শুকিয়ে গেছে। 'কি হল কি হল আমার!' মালা নিজেকে প্রশ্ন করল। শরীরের সব কটা ইন্দ্রিয় তার বন্ধ হয়ে আছে মরে গেছে। কেবল শরীরটা আছে। স্থির অনড় ঠাণ্ডা শক্ত একটা বড় মাংস খণ্ড। দোকানে ঝুলিয়ে রাখা মাংসগুলো মনে পড়ল মালার। আজ ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে আছে কাল সকাল থেকে পচতে আরম্ভ করবে। তারপর পোকা পড়বে পোকা কিলবিল করবে। এর দাম নেই। উঃ এতবড় ঠাট্টা! আমিও রইলাম তোমার স্বামীও রইল! তবে আরো একজন থাকতে দোষ কি, আরো

একজন, আরো আরো—বিকেলে বাড়ির সামনের পার্কে যত পুরুষ জড়ো হয় সব। দেয়ালটা শক্ত করে ধরে না রাখলে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ত ও। পড়ল না। দাঁড়িয়ে থেকে কেবল মার মুখ মনে করতে চেষ্টা করল, আর কিছু না, আর কেউ না।

চোদ্দ

'ঈশ্বরের ইচ্ছা, সবই ভগবানের হাত।' চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল প্রফুল্ল। 'না হলে ও এদিকে যেমন একটু বেশি তাত্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিল, পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিয়েছিল ঠিক তখনই কেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার কথা মনে হবে মাণিকের নিজে এসে উপস্থিত হবে।'

'যাক গে, ও রাজী আছে তো, যাবে তোমায় বললে?' রমলা তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর মুখ দেখল।

প্রফুল্ল হেসে ঘাড় নাড়ল।

'যাবে না অর্থ কি! আমি বললে নিশ্চয় তাকে যেতে হবে। স্বামীর কাছে না গিয়ে উপায় কি।' একটু থেমে থেকে প্রফুল্ল বলল, 'অবশ্য অনেক বোঝাতে হয়েছে। হ্যাঁ, আবার যদি যন্ত্রণা-টন্ত্রণা দেয় শুনি আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি মালাকে এখানে চলে আসতে। আমার দরজা সব সময় তোর জন্যে খোলা আছে, আমি দু মুঠো খেলে তুই খাবি। হ্যাঁ যদ্দিন পর্যন্ত বুঝব যে আমার বোন বিনা কারণে বিনা দোষে লাঞ্ছনাগঞ্জনা পাচ্ছে—ভাল বলিনি?'

রমলা চুপ করে কি ভাবল। কোলের বাচ্চাটাকে দোলাতে লাগল।

প্রফুল্ল বলল, 'তোমার কাছে কি পোস্টকার্ড আছে এক আধটা। আজই 'বরানগর' চিঠিটা চলে যাক।'

কপালে ভুরু তুলল রমলা।

'সে কি, পোস্টকার্ডে চিঠি লিখবে মালা ওর বরের কাছে। নাকি ওর শ্বশুরকে লিখছে।'

প্রফুল্ল মাথা নাড়ল।

'এতক্ষণ তো বোঝালাম,—কিন্তু রাজী করাতে পারলাম না। লজ্জা করে, বলল, আমি পারব না। বলল, তুমি লিখে দাও। তা ছাড়া তুমিই তো আমার এখানকার অভিভাবক। তোমার চিঠিতেই কাজ হবে বেশি। সুতরাং—'

'বুঝলাম।' মুখটা অপ্রসন্ন রয়ে গেল রমলার। 'ও লিখলেই ভাল হত। ও স্ত্রী। তুমি কবে এসে মালাকে নিয়ে যেতে লিখছ?'

'এই একটা ভাল দিনটিন দেখে?'

'খবরদার! আর দিন দেখাদেখির কাজ নেই। যেন চিঠি পাওয়া মাত্তর মালাকে এসে নিয়ে যায়। কাল বা পরশু। আজ এই সকালের ডাকে চিঠি ফেললে কাল সকালেই মাণিক পেয়ে যাচ্ছে। আছে, পোস্টকার্ড যেন একটা আছে আমার কাছে।' বাচ্চাকে ধপাস করে বিছানায় নামিয়ে রেখে রমলা উঠে টেবিলের কাছে ছুটে গিয়ে হাত-বাক্স হাতড়াতে লাগল।

যেন এতক্ষণ পর একটা বিড়ি ধরাবার সুযোগ পেল প্রফুল্ল। বিড়ি ধরিয়ে প্রসন্ন গলায় বলছিল, 'দেখলাম সংসারে ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য জিনিসগুলো এখনো আছে। জানতাম আমার বোন যখন আজ অবধি কোনো অধর্মের কাজ করে নি, খাঁটি আছে, তখন ও কষ্টে থাকবে না—নিশ্চয় আবার একদিন স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করবে—তাই হল তাই হবে—ঠিক

কিনা।'

'দাঁড়াও বাপু।' ওদিক থেকে রমলা রুষ্ট গলায় বলল, 'এত তত্ত্বকথা শোনাতে পার তুমি! কোথায় গেল কার্ডটা এখানেই তো কাল বিকেলে রাখলাম ছাই—আর কোথায় যেতে পারে!'

পোস্ট কার্ড খুঁজে বার না করা পর্যন্ত রমলা কোনো কথা কানে নেবে না চিন্তা করে প্রফুল্ল চুপ করে বিড়ি টানতে লাগল।

নীল জ্যোৎস্না ঝরা রাত্রির পর দিন তো উজ্জ্বল হবেই। বড় বেশি উজ্জ্বল বড় বেশি মাজাঘষা চেহারা আকাশের রৌদ্রের। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টি ঝাপসা ঠেকে, চোখের পাতা আপনা থেকে বুজে আসে। তা হলেও মালার ভাল লাগছিল এই প্রখরতা এই ঝাঁজ। দাদাকে কোনোরকমে কথাটা দিয়ে এসে ও রান্না-বান্না ঘোয়া-মোছা সেরেছে। দাদা বৌদি চান করেছে ভাত খেয়েছে তারপর কাজে বেরিয়ে গেছে। মালা বাচ্চাটাকে চান করিয়েছে খাইয়েছে। ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়েছিল এখন উঠে আবার কাঁদছে। কাঁদুক। মালা চান করে নি খায় নি। ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে ঘুরে জানালায় এসে গরাদ ধরে কেবল বাইরেটা দেখছে। এত ভাল লাগছিল তার। এত ভাল লাগছে রৌদ্রের জ্বালা আকাশের আগুনে। ভিতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। মালার মনে হল এই আগুনে যারা পুড়ে যেতে পারে তারা শুদ্ধ হয় তারা পবিত্র হয়।

একটা ভোমরা কানের কাছে গুণগুণ করছে অনেকক্ষণ ধরে। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে। গানটা মালার বারবার মনে পড়ছে। কবে কার গলায় শুনেছিল মনে করতে পারছে না। কিন্তু তখন গান শুনে এত ভাল লাগেনি তার এখন ভোমরার ওড়াউড়ি দেখে আর গুণগুণ শুনে যত ভাল লাগছে।

না কি আজ তার সব ভাল লাগছে! বাইরে আকাশ, রোদ, ঘরের ছায়া, ছায়ার অন্ধকারে চোখ জুড়ানো কালো ভ্রমরের নাচানাচি!

একটা লম্বা নিশ্বাস ওর বুকের ভিতর থেকে উঠে এল। তাই হয় তাই হয়।

মানুষের জীবনে, সব মানুষের জীবনে এমন একটা দিন আসে যেদিন আকাশের নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে এই পৃথিবীর কুটোটা ধুলোর কণাটাও ভাল লাগে। মনে হয় এদের আমি কোনোদিন ভাল করে দেখিনি। আজ ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যদি কেউ তাড়া দেয়, দেখা শেষ হল কিনা প্রশ্ন করে, তবে তার ওপর রাগ হয়, তাকে মারতে ইচ্ছা করে কামড়াতে ইচ্ছা করে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখব।

এই ইচ্ছা বুকে নিয়ে মালা জানালা থেকে সরে এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রমলার ছেলেকে দেখতে লাগল। রমলার মুখ। রমলার মুখকে মালা কতদিন ঘৃণা করেছে। আজ আর ঘৃণা না। আজ কাউকে ঘৃণা না, কটু কথা না। ভালবাসা, শুধুই ভালবাসা। রমলার ছেলেকে বুকে তুলে ওকে ভালবাসার চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিতে দিতে মালা ঘর ছেড়ে তাদের সরু প্যাসেজে এসে দাঁড়ালো। যেন ওদিকের পৃথিবী দেখা শেষ করে মালা এই জগতটা দেখতে এসেছে। চোখাচোখি হল হরির মার সঙ্গে। নীরদের থালা গ্লাশ ধুয়ে বুড়ি কলতলা থেকে আসছে। মালাকে দেখে হাসল।

'শুনেছি, বৌদির মুখে এই মাত্তর শুনলাম। জামাই নিতে চাইছে। কাল চলে যাচ্ছ।

কাল বা পরশু।'

'হ্যাঁ, হরির মা চলে যাচ্ছি। আর কত, অনেকদিন তো থাকলাম, অনেকদিন কাটালাম তোমাদের সঙ্গে।'

যেন এতক্ষণ পর এই প্রথম 'চলে যাচ্ছি' কথাটা জানাবার মতো একটা মানুষ দেখে মালার দু চোখ জলে ভরে উঠল। বৃষ্টির ফোঁটার মত দুটো বড় ফোঁটা টুপ করে নীচে ঝরে পড়ল।

'ছিঃ ভাই কাঁদে না।' হাতের থালা গ্লাশ নামিয়ে রেখেই বুড়ি কথা আরম্ভ করেছিল। এখন সেই হাত দিয়ে মালার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল। 'চিরকাল কি আর কেউ বাপ ভায়ের কাছে থাকতে পারে। মেয়েছেলে পারে না। মেয়েছেলের সব ইস্টির ইস্টি সব দেবতার দেবতা হল বর, সোয়ামী।' একটু থেমে বুড়ি হঠাৎ নিজের চোখ মুছতে আরম্ভ করল। 'কত ভাল মেয়ে, কত সুন্দর মেয়ে। তাই তো আমি ভাবতাম, এই মেয়ে কেনে দুঃখু পাবে এই মেয়ের কপালে তো আমি তেমন কোনো মন্দ চিহ্ন দেখি নে—তাই তো বলে পুণ্যির জয় সতীর জয়—সোয়ামী যদি এমন মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে না নিতে আসবে তবে আর কাকে নেবে। যাও ভাই, সুখে থাক।'

'মালা-দি মা-লা-দি।' ক্ষীণ নিস্তেজ কণ্ঠস্বর পাশের ঘর থেকে ভেসে এল।

মালা বুড়ির চোখের ভিতর তাকায়। হরির মা এবার হাসল। 'আমার খোকন সোনা ডাকছে তোমাকে। ওকেও খপরটা দিয়ে এনু কিনা।'

'যাচ্ছি।' মালা বাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে নীরদের ঘরের দিকে চলল। হরির মা পিছনে হাঁটে। হাঁটে আর কতদিন একসঙ্গে দুজনে গল্প করে করে দুপুর কাটিয়েছে সে সব কথা তোলে।

'তুমি চলে যাচ্ছ মালাদি।'

'হ্যাঁ, ভাই। আর কতদিন তোমাদের সঙ্গে থাকব। এবার চলে যেতে হচ্ছে।' বাবুর মাথার ওপর হাত রাখল মালা। মুখখানা দেখতে লাগল। প্রতিমার মুখ। কিন্তু প্রতিমাকে সে কোনোদিন ঘৃণা করে নি, হিংসা করে নি। আজ তো আর সে সবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আজ—

'মালাদি, তুমি আমাকে চিঠি লিখবে?'

'লিখব, নিশ্চয় লিখব।' মালা মধুর হাসল। 'তুমিও আমাকে চিঠি লিখবে। পারবে না—' হঠাৎ যেন ব্যথা পেয়ে মালা থেমে গেল।

'তাতে কি।' বাবু হাসল, 'আমি বাবাকে বলে বলে দেব। বাবা লিখবে। হ্যাঁ, নামটুকু আমি শুয়ে থেকেও সই করতে পারব—হবে না?'

'হবে।' কোমল চোখে মালা নীরদের ছেলেকে দেখে শেষ করে উঠব উঠব করছিল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল বাবুর।

'তুমি কাল পরশু চলে যাবে। আমরাও এ মাসে চলে যাব মালাদি। এ মাসের শেষের দিকে।'

'কোথায়?'

'আজকে বাবা বলছিল তাঁর ছুটির অর্ডার হয়ে গেছে। তিন মাস। আমায় নিয়ে বাবা চেঞ্জে যাবে—পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে।'

'ভাল।' বুকের ভিতর ধক করে উঠতে চেয়েছিল। একটা বড় ঢোক গিলে মালা তা চাপা দিল।

'ফিরে এসে আমি তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাব কি কি দেখে এলাম—কেমন?'

'তাই জানিও। চলি ভাই।' নুয়ে বাবুর কপালে চুমু খেল মালা। পরের ছেলেকে চুমো খেতে দেখে ঘরের ছেলে—রমলার ছেলে ঈর্ষায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'ছিঃ কাঁদে না, কাঁদে না, এই তো তোমায় আমি চুমো খাচ্ছি।' বলতে বলতে মালা নীরদের ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। 'চিরকালের মতো চিরজন্মের মতো তোমার ঘর তোমার ছেলেকে দেখা শেষ করে এলাম। আর কোনোদিন দেখতে যাব না দেখা হবে না—আর—'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপতে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। রক্ত এল যেন। জিভের ডগা দিয়ে রক্তটা চেটে নিয়ে মালা গিলে ফেলল। 'ভালই হল। একটু রক্তের দরকার ছিল। রক্ত না গিলতে পারলে চোখে এখন বর্ষার ধারা নামত। তা আর নামতে দিলাম না।' বলতে বলতে,—ভাবতে ভাবতে মালা তাদের ঘোরানো লোহার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়। 'এদিকটা দেখা হয় নি। দেখে নীচে নামব। নীচেটাও দেখে যাওয়া দরকার।' রমলার বাচ্চার কান্না তখনও থামছিল না। 'কাঁদে না, ছিঃ কাঁদে না। চলো নীচে চলো, আমি তোমায় লজেন্স কিনে দেব।'

সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙছে আর মালার সুন্দর পা দুটো কাঁপছে। 'চলি, চললাম রে ভাই, আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না।' যেন অনেককালের পরিচিত বন্ধু সিঁড়িটাকে সম্বোধন করতে গিয়ে মালা থমকে দাঁড়ায়। ভাবে। 'কতটা আফিং একজন মানুষ খেলে তবে সে মরে—কিন্তু লালুকে কি দোকানী আফিং দিতে চাইবে—ছোট ছেলেদের কাছে ওরা নাকি এসব জিনিস বিক্রী করে না—' তারপর মালা আবার ভাবল : 'আফিং-এর দোকান এ পাড়ায় আছে কি। ঠিক জানা নেই। লালমোহন খুঁজে বার করতে পারবে কি—রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করবে—কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ সন্দেহ করে বসে।' মালার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। একটা হাত সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর। আর এক হাত দিয়ে রমলার বাচ্চাকে ধরে রেখে নীচের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো চিন্তা করছে ও। হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটা নিশানের মতো পতপত করে উড়ছে। শুকনো বাসী খোঁপাটা অর্ধেক ভেঙে ঘাড়ের ওপর থুবড়ে পড়ে আছে। 'তা হলেও একবার চেষ্টা করতে হবে তো—যদি তা একান্তই যোগাড় না হয়—না পাওয়া যায়—' আবার নীচেটা দেখল মালা। খোয়া আর পাথরের টুকরো আর কিছু আস্ত ইট। 'এতটা উঁচু থেকে লাফিয়ে নীচে ওসবের ওপর পড়লে—প্রাণটা সঙ্গে সঙ্গে বেরোবে—না কি হাত পা ভেঙে বিশ্রী একটা অবস্থা হয়ে থাকবে? তবে আর একটু ওপর থেকে আর দু ধাপ উঁচু থেকে?' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মালার বুক কাঁপতে লাগল। 'তা এখন তো কাঁপবেই—এখন ভাবতে গেলে ভয় করা স্বাভাবিক। ঝোঁকের মাথায় যেমন হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে লাফ দিতে হয় দেব দরকার হলে।' আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছল মালা।

রমলার বাচ্চা আবার কাঁদছে।

'চলো, চলো লালুর কাছে।' সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করল মালা। 'লালু তোমায় বিস্কুট কিনে এনে দেবে। আমি বললে ও সব এনে দেয়—দেবে।'

'এই লালু, শোন।'

'দেখে যাও মালাদি, ইদিকে এসো দেখবে।' ওষুধের আলমারীর পিছনে দাঁড়িয়ে লালমোহন উত্তেজনায় কাঁপছে।

'আগে তুই শোন না।' মালা ডাক্তারের শূন্য চেয়ারটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ডাকে। 'আমাদের খোকনের জন্য একটা ভাল বিস্কুট এনে দে, মোড়ের দোকানে পাবি, আর আমার জন্য এক আনার ডালমুট আর—তুই আমার কাছে আয় না।'

'তুমি এসো, এসে একবারটি শুধু দেখে যাও।'

'কি দেখব?' মালা বিরক্ত হয়ে এক পা এক পা করে আলমারীর ওধারে যায়। 'কি করছিস তুই এখানে?'

'এই দেখো,—এই যে—'

এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে আছে লালমোহন এক ভীষণ খেলার পরীক্ষা তার ছোট্ট চোখ দুটোতে তাঁর তীক্ষ্ণ হয়ে জ্বলছে।

মালা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

লালমোহন ফিসফিসিয়ে উঠল।

'তুমি দেখ, এক দুই তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা মরে কিনা।'

কথা বলছে না মালা। হা করে তাকিয়ে আছে। ইঁদুরের খাঁচাটাকে দেখছে। একটা ছোট কাগজের পুরিয়া থেকে দেশলাইয়ের কাঠির মাথায় করে খানিকটা গুঁড়ো তুলে লালু জিলিপীর ভাঙা টুকরোটার ওপর রাখে তারপর কাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে টুকরোটাকে খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। ইঁদুরটা ভয়ে সরে গিয়ে খাঁচার আর এক কোণায় আশ্রয় নেয়। খাঁচার ধার থেকে লালমোহন হাতটা সরিয়ে আনতে ইঁদুরটা ছুটে এসে জিলিপীর টুকরোটায় কামড় বসিয়ে দিল। এক দুই তিন। লালমোহন ফিসফিস করে উঠল। মাত্র একবার। একটুখানি ছুটতে পারল বেচারা। আর পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শরীরটা সামান্য কাঁপল। লেজের ডগাটা দুবার নড়ল। তারপর সব শেষ। যেন দেখতে দেখতে শক্ত হয়ে গেল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা চোখ বোজা একটা খোলা। মুখটা একটু খোলা। তাতেই দেখতে পাওয়া গেল শাদা ধারালো মসৃণ দু'পাটি দাঁত দিয়ে বেচারা জিভটা কামড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল। যাতে জিভটা মুখ থেকে আলগা হয়ে থাকে। লালার সঙ্গে গলে গিয়ে বিষটা পেটে ঢুকতে না পারে। কিন্তু পারল কি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে। যেটুকু পেটে গেছে তাতেই কাজ হয়েছে। যেন মরবার আগে ও টের পেয়ে গেল কেন তার এই মৃত্যু।

এক ফোঁটা রক্ত ঠোঁটের পাশে জমেছে মালা লক্ষ্য করল।

'কি করলি। মরে গেল?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।' লালু শব্দ না করে হাসে।

মালা নাকে কাপড় গুঁজল।

'পচা পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। যেন তোর এখানটায় আরো ইঁদুর মরে পচে আছে।'

লালু এবার অল্প শব্দ করে হাসল।

'মরা ইঁদুর দেখলেই তোমরা ইঁদুর পচল ভাব।' অন্ধকার কোণা থেকে আর একটা খাঁচা তুলে আনল লালু। 'এই তো এখানে আরো দুটো রয়েছে। কিন্তু পচে নি তো। কতক্ষণ? আধ ঘণ্টাও হয় নি মরেছে। মারলাম আমি নিজের হাতে।'

'ওই গুঁড়ো খেয়েই মরল!' মালা তেমনি হা করে তাকায়।

লালু মাথা নাড়ল।

'ওধারের কমল ময়রার দোকানে আজ তিন তিনটে ইঁদুর খাচায় আটকা পড়েছিল। আমি চেয়ে নিয়ে এলাম। কালকে এনেছিলাম একটা। ওদের ঘরে লাখ লাখ ইঁদুর হয়েছে।'

একটা বড় ঢোক গিলল মালা।

লালু বলল, 'তা মাগনা কি আর দেয় কেউ কিছু আজকাল। এমনি ওরা মেরে ফেলত। গরম লোহার শলা দিয়ে গুঁতিয়ে কি জলে ডুবিয়ে। আমি কমল ময়রার ছেলেকে তিন আনা নগদ দিয়ে তিনটে কিনে এনেছি। বললাম আমার একটা জিনিস পরীক্ষা করার আছে। কালকে যেটা ধরা পড়েছিল সেটা এমনি দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু। আজ চাইতেই পয়সা—তা কেমন দেখলে?'

মালা বেশ একটুক্ষণ লালুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তাকিয়ে থেকে কি ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?'

'বিকেলের আগে না। চারটে বাজবে। সাড়ে এগারোটায় ভাত খেতে চলে যায়। ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে হয়।'

'তোর খাওয়া হয়ে গেছে?'

'এই তো একটু আগে হোটেল থেকে খেয়ে এসে কাজে লেগেছি।' লালু কাগজের পুরিয়াটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নেয়। মালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর এক সময় ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর মুখটা লালুর মুখের কাছে সরিয়ে নেয়।

'গুঁড়োটা কোথা থেকে যোগাড় করলি?'

মালার প্রশ্ন শুনে লালমোহনকে এই প্রথম চমকে উঠতে দেখা গেল। কিন্তু সামলে নিল। চালাক ছেলে। মিষ্টি হেসে বলল, 'কেন বল তো মালাদি?'

'না এমনি, এমনি জিজ্ঞেস করছি, সাংঘাতিক বিষ কিনা?'

'সাংঘাতিক মানে!' উত্তেজনায় লালুর গলার স্বরটা কেমন খসখসে শোনায়। 'আলপিনের আগায় করে একটু জিভে ঠেকালেই—বাস হয়ে গেল।'

যেন উত্তেজনায় মালার বুকটা কাঁপছে। হঠাৎ বুকের ভিতর দুরদুর শব্দটা তার কানে এল। মুখের ভাব গোপন করতে তাকে অন্যদিকে তাকাতে হল পর্যন্ত। তারপর সামলে নিল। মিষ্টি হেসে বলল, 'আমায় একটুখানি দে কাগজে করে—'

'কেন তোমার কি—?' লালু থেমে থেকে মালার চোখ দেখে।

'ভীষণ ইঁদুর, আমাদের ওপরটায় যা ইঁদুর হয়েছে কী বলব!'

এক সেকেন্ড কি ভাবল লালু। তারপর আর ভাবল না। যেন কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। সাঁ করে ছুটে গিয়ে সামনের দিকের দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে এসে লালু ছুটে গেল আলমারীর কাছে। টাঁক থেকে একটা ছোট চাবি বার করে আলমারীর ডালা খুলে একটা ছোট নীল শিশি বার করে আনল। এক টুকরো কাগজে খানিকটা গুঁড়ো ঢেলে নিয়ে শিশিটা আবার জায়গামত রেখে দিল। তারপর আলমারীর তালা বন্ধ করে কাগজের পুরিয়াটা মালার প্রসারিত ডান হাতের ওপর তুলে দিয়ে বলল, 'নাও খুব সাবধান! হাত দিয়ে ছোঁবে না।'

'না ছোঁব না।' হাত কাঁপছিল মালার। আর একটা ঢোক গিলল। পুরিয়াটা ব্লাউজের মধ্যে ঢোকাল। তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ওই চাবি কোথায় পেলি!'

'তালাওয়ালাকে ডেকে করিয়ে নিয়েছি। না হলে কি আর ডাক্তার আমার জন্যে আলমারী খুলে রেখে যায়। অথচ আমি এসব পরীক্ষা-টরিক্ষা করতে এক ফোঁটা ওষুধ পাইনে। তাই তো—'

'দেখিস খুব সাবধান।' মালা এবার সরে এসে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিল। রোদের ঝলক ঘরে ঢুকতে তার ভাল লাগল।

'আমি সাবধান আছি।' বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল লালমোহন। 'আমি তো জানি এখানকার কোন ওষুধের কি কাজ কোন বিষের কি কেরামতী। হি-হি রাতদিন এসব নিয়েই আছি।'

'সাবধান খুব সাবধান!' বলতে বলতে মালা দরজার বাইরে চলে এল।

'তুমি কিন্তু হাত দিয়ে মোটেই ছোঁবে না।' পিছন থেকে লালু বলল। 'কই, বিস্কুট-টিস্কুট আনতে দিলে না, মালাদি।'

'দাঁড়া আমি ওপরে এটা রেখে আসি। এসে তোকে বিস্কুটের পয়সা ডালমুটের পয়সা দেব।'

ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল মালার, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোরানো সিঁড়ির কাছে চলে এল ও। কোলে রমলার বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওপরে এসে কেমন ক্লান্তি বোধ করছিল ও। যেন অনেক পথ হেঁটে এসেছে। বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মালা স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেলতে পারল। তা হলেও তার যেন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। মেঝের ওপর দু পা ছড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে বসল ও। ব্লাউজের ভিতর থেকে পুরিয়াটা বার করল। পুরিয়া খুলে শাদা গুঁড়োটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পুরিয়াটা মুড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে মেঝের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল। একটুখানি নীচে থেকে ছুটে এসে এতটা ক্লান্তি বোধ করছে কেন মালা ভেবে পেল না। তার মনে পড়ল ছোটবেলাকার এক বিকেলের কথা। কত বয়স? বছর এগারো? তারও কম। পুরো দুটো সপ্তা জ্বরে ভুগে উঠে সেদিন বুঝি পথ্য করেছিল ও। বিকেল পড়তে ঘরের পৈঠায় পা ঝুলিয়ে বসে উঠোনের পাশে পেয়ারা গাছটার দিকে তাকিয়ে কচি সবুজ পেয়ারা পাতাগুলো দেখছিল। সবে ফাল্গুন মাস শুরু হয়েছে সেদিন আর এক সপ্তা এত কোমল নরম কচি-পাতায় গাছটা ছেয়ে গেল দেখে তার মনটা যে কী ভাল লাগছিল! পৈঠা ছেড়ে আস্তে আস্তে ও পেয়ারা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। মা এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। গলার স্বরে টের পেল। 'পায়ে জোর পাচ্ছিস হাঁটতে পারছিস একটু?' 'একটু একটু পারছি মা'—মালা বিষণ্ণ হেসে উত্তর করেছিল। এবং একটুখানি হেঁটে যাওয়ার দরুণ যে সে হাঁপাচ্ছিল ক্লান্তি বোধ করছিল মার কথা শুনে তবে বুঝতে পারল। টিয়ে রঙের নতুন পেয়ারা পাতাগুলো তাকে টেনে নিয়ে গিছল উঠোনের ওধারে। আজ? আজ সেই ক্লান্তি তার শরীরে মনে। কিন্তু সেদিন তো মার হাতে ধরে মার বুকের ওপর মাথার ভর রেখে শরীরের ভর রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে আবার পৈঠায় এসে উঠেছিল।

আজ?

জল গড়াতে লাগল মালার চোখ দিয়ে।

আজ কটা দিন ধরে কেবল ছোটবেলার কথাগুলো তার মনে হচ্ছে, ছবিগুলো চোখের ওপর ভাসছে। কেন? তাই হয়। চিরকালের জন্য যে-মানুষ চোখ বুজতে যাচ্ছে তার চোখের সামনে এসব ছবি এসে ধরা দেয় বোঁক। চিরদিনের মতো মালার চোখের আলো নিভতে চলল।

কটা বাজে? যেন হঠাৎ সময়ের কথা মনে পড়ে ও চমকে উঠল। জানালার বাইরে পাশের বাড়ির টালির ছাদে সেই লম্বা ছায়াটা পড়েছে না? ছায়া দেখতে মালা উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তিনটে বাজে। একটু পর কলে জল আসবে। বিকেলের কাজগুলো তো সেরে রাখতে হবে। না তার আগে আর একটা কাজ আছে। বাপীকে দুধ খাওয়াতে হবে।

না, মালা চাইছে চিরদিনের মতো এই সংসার ছেড়ে যাবার আগে সে সব কটা কাজ ভাল-করে করে যাবে। যাতে রমলা এসে দেখে খুশি হয় দাদা সুখী হয়। মালা মরে যাওয়ার পরও কথাটা যাতে তাদের মুখে লেগে থাকে। 'না, এমন মেয়ে আর হয় না। কী সুন্দর ঘরের কাজকর্ম করত! একটু আলস্য ছিল না, একটু—'

মালা ঘর ঝাট দিতে আরম্ভ করল। দুটো ঘর বেশ করে ঝাট দেওয়া হয়ে গেলে মেঝে দুটো মুছে ফেলল। তারপর হাত ধুয়ে কাগজ জ্বেলে বাচ্চাটার দুধ গরম করতে বসল। 'বাপি!' মালার কোলে বাপী। 'আমি মরে গেলে আমার চেহারা তোর মনে থাকবে বড় হয়ে আমার মুখ মনে করতে পারবি?'

শিশু কালো চোখ মেলে মালার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। হাত নাড়ে পা নাড়ে। যেন কথাটা শুনে ও বেজায় খুশি হয়েছে।

তারপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মালা এক সময় কথাটা চিন্তা করল। আজ সে সাজবে। বেশ ভাল করে সাজবে। আর তো এ-জীবনে সাজা হবে না। সেজে আয়নায় নিজেকে দেখবে। সব কিছু তো তার দেখা শেষ হল। এখন শুধু নিজেকে দেখা বাকী। শেষ দেখা। শেষ দেখা। শেষ দেখা। নিজেকে চিরজন্মের মতো দেখে শেষ করার উত্তেজনায় তার হৃদ্‌পিণ্ড দুব দুব করতে লাগল। বিষের পুরিয়াটা ব্লাউজের নীচে বুকের ঘামে ভিজছে টের পেল ও। ভিজুক। 'ঘাম এই বিষের কিছু করতে পারে না। এই বিষ চায় শুধু রক্ত—বাসী পচা ঠাণ্ডা রক্ত না, আমার শরীরের গরম টাটকা রক্ত।' মালা বিড়বিড় করে উঠল।

দুধ খাওয়ানো শেষ করে বাকী কাজগুলো এক দমে শেষ করে ফেলল ও। কলতলায় আর একবার বুড়ির সঙ্গে দেখা। 'আমার দিদিকে আজ খুব খুশিখুশি লাগছে।' বুড়ি বলছিল। 'স্বামীর কাছে যেতে পারলে সব মেয়ে খুশি—না হরির মা?' হেসে উত্তর করে মালা গুনগুনিয়ে কি যেন একটা গান গাইছিল।

গা ধুয়ে ঘরে ফিরে মালা সকলের আগে পায়ে আলতা পরল। তারপর চুল নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল ও। তারপর সেই ঘন কালো রাশি রাশি চুল দিয়ে এক আশ্চর্য খোঁপা করে ফেলল। আয়নায় দেখে মালা অবাক। এমন সুন্দর খোঁপা তো সে অনেকদিন করতে পারে নি। বুকটা টনটন করে উঠল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মালা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিন্তু তা হলে হবে কি। রুদ্ধ কান্নার ধমকে বুক ফুলে ফুলে ওঠে। শরীর থরথর করে কাঁপে। 'এই নাক এই চিবুক এই ভুরু এই

চোখ নিয়ে আমি ফুলের মতো সুন্দর এক মেয়ে। কিন্তু তা হলে হবে কি। এই ফুল দেবতার পুজোয় লাগল না খেলার সাথীর খেলায় লাগল না। তুমি তো এক সুন্দর সাথী হয়ে এসেছিলে আমায় নিয়ে খেলবে বলে। এখন ভয় পাচ্ছ কেন। খেলার মধ্যে আবার ভয় কি। এসো এসো। যদি না এসো তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কি?'

মালা চিন্তা করতে লাগল। 'মরবার আগে আর একবার বললে হয় না?' হবে না হবে না। ভাল কথায় কাজ হবে না। তবে কি—

কুটিল কঠিন হয়ে হয়ে উঠল মালার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি মেলে ধরল ও দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায়। তারপর এক সময় রোদ মুছে গেল আলো নিভে গেল। পাউডারের ডিবি স্নোর কৌটো আলতার শিশি তুলে রাখল মালা। ধোয়া শাড়ি ব্লাউজ নামিয়েছিল পরবে বলে সেগুলো আবার বাক্সে ঢোকাল। খোঁপা ভেঙে ফেলল। তারপর সাবান আর জল নিয়ে বসল পায়ের আলতা তুলতে।

'ওকি! এ তুমি করছ কি ঠাকুরঝি।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা হাসতে লাগল। 'বেশ তো সেজেছিলে। এতে লজ্জার কি। কাল পরশু মাণিক যখন নিতে আসবে আলতা তো পরতেই হবে।'

মুখ তুলে শূন্য অপলক চোখে মালা রমলাকে দেখতে লাগল। যেন বৌদির কোন কথা তার কানে যাচ্ছে না। কালা হয়ে গেছে। কোন কথা বলতে পারছে না। বোবা হয়ে গেছে।

'তোমার কি হয়েছে মালা?'

কথার উত্তর না দিয়ে মালা সাবান ঘষে পায়ের সবটুকু রং তুলে ফেলল।

পনেরো

'মিথ্যা কথা।'

'সত্যি কথা, সত্যি।'

'বাজে কথা।' নীরদ এক হাতে দেয়ালটা শক্ত করে ধরল। 'এ হতে পারে না, আমি বিশ্বাস করিনে।'

'আশ্চর্য!' মালার ঘন নিশ্বাস পতনের শব্দ নীরদের কানে লাগল। 'বিশ্বাস আমিও করিনি, এখনও করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু—'

'কদিন বলছ তুমি?' নীরদ গলা নরম করল। 'মানে কবে থেকে—'

নীরদের কানের কাছে মুখ এনে মালা ফিসফিসিয়ে উঠল।

'এগারোই জ্যৈষ্ঠ।' মালার কথার পুনরাবৃত্তি করল নীরদ। 'হ্যাঁ, বলো—' যেন শেষ দিকে নীরদের গলার স্বর ঈষৎ কেঁপে উঠল।

'তাহলেই হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এক মাসের বেশি হয়ে গেছে। তাতেই তো কেমন সন্দেহ হচ্ছে।' মালা থামল। মালার চোখ দেখা যাচ্ছে চোখের রং বোঝা যায় না। ঠোঁট দেখা যায়। ঠোঁটের কিনারে কুটিল হাসি অন্ধকারে নীরদ দেখতে পেল না।

'বাজে, বাজে সন্দেহ, কিচ্ছু ভয় নেই।' এবার গলার স্বর সংযত ও কঠিন রেখে নীরদ বলল, 'ও এমনি তারিখের একটু নড়চড়—'

'আজ তুমি এটাকে সন্দেহ বলে উড়িয়ে দিচ্ছ, কাল সন্দেহ যখন সত্য হবে তুমি বলবে

আমি জানি না, আমি দায়ী নই।' যেন কাঁদত মালা, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে ও হাসল।

'কী আশ্চর্য! তুমি এসব কি বলছ?' নীরদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর হিসহিস করে উঠল। 'ইস তুমি এখনি এসব কথা—'

'আমি জানি তুমি এই বলবে—তোমার মত কাপুরুষেরা শেষ পর্যন্ত তাই বলে।' হাসল না মালা, রাগ করল না, যেন চরম কথা শুনিয়ে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা ভাবল নীরদ তারপর মালার একটা হাত শক্ত করে ধরল সে।

'এই শোন!'

'কি?'

'এরকম হচ্ছে আরো দু'চার দিন কি হপ্তাখানেক আগে তুমি আমায় বলতে পারতে। চুপ করে আছ কেন?'

'কি করতে তুমি, কি করতে আমায় বলো যদি আরো আগে জানতাম।' ব্যঙ্গ করে উঠল মালার কণ্ঠস্বর। 'তা ছাড়া বলিনি বলা হয়নি দেখছিলাম বলে, অপেক্ষা করছিলাম—আসলে সন্দেহ সন্দেহ কিনা।'

যেন নিরুপায় হয়ে নীরদ মালার হাত ছেড়ে দিল। ভয়ঙ্কর ঘামছিল সে। গেঞ্জিটা ভিজে গেছে টের পেল। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে দূরের পেটা ঘড়িতে একটা বাজল।

'যাক এসব ব্যাপার নিয়ে ছেলেমানুষী করা ঠিক হবে না।' নীরদ এবার তাড়াতাড়ি বলে শেষ করতে চেষ্টা করল। 'ডাক্তার দেখাতে হবে, দেখিয়ে কনফার্মড হতে হবে অর্থাৎ ঠিক করে জেনে নিতে হবে আসলে—' থামল নীরদ।

'তারপর?'

'তারপর কাজ খুব সহজ—এসব নিয়ে আজকাল আবার ভাবতে হয় নাকি। এসো শোন—'

'আমার গায়ে হাত দিও না। তারপর কি করা হবে সেটাই আমি জানতে চাইছি।'

নীরদ মৃদু হাসতে চেষ্টা করল।

'তুমি কেবল অশিক্ষিত নও পাড়া গাঁ থেকে এসেছ—'

'হ্যাঁ বলো, শহুরে শিক্ষিত মানুষ হয়ে তুমি তারপর আমার কি উপায় করবে বলে ভেবে রেখেছ শুনি? কি করবে যদি—'

'অনেক ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল, আজকের দিনে এটা তেমন কিছু কঠিন কাজ না।'

'হ্যাঁ, তাও শুনি, কি করবে?' মালা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে চাইছে।

'নষ্ট করে ফেলব, ওষুধে নষ্ট করে দেবে।'

'কাকে?' কথা শোনা গেল না মালার, কেবল গলার একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। কাকে? কাকে? যেন শব্দটা অন্ধকার দেয়াল থেকে দেয়ালে আঁচড় কেটে কেটে বেড়াতে লাগল। একটা চামচিকে থেকে থেকে পাখা ঝাপটাচ্ছে অন্ধকার কোন কোণায়।

নীরদ নীরব। উত্তর নেই।

'তাই আমি জানতে চাইছিলাম তোমার কাছে।' কুটিল ক্রূর গলায় মালা আবার হাসল। 'হয়তো আমার ভয় সন্দেহ মিথ্যা হবে। হয়তো কিছুই হবে না। কিন্তু কোন সত্য নিয়ে তুমি বেঁচে আছ তাই দেখছিলাম।'

'মালা?'

'ঠিক আছে।' যেন বড় বেশি নিঃসংশয় হতে পেরে মালা তৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'চলি চললাম।'

'এই শোন!'

'আমার হাত ধরবে না।'

'এই তুমি কি করছ, এই এই!' উন্মত্ত ঝড়ের মতো নীরদ মালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'দেখি তোমার হাতে কি, এটা কিসের পুরিয়া?'

মাত্র এক সেকেণ্ড। এক সেকেণ্ড কম সময়ের মধ্যে পুরিয়া খুলে মালা গুঁড়োটা মুখে ফেলতে পারত। পারল না। যেন নীরদ বুঝতে পেরেছিল যেন সে তৈরী হয়ে ছিল এমন একটা সাংঘাতিক কিছু করবে মালা। ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে পুরিয়াটা সে তুলে নিল।

'পাগল মূর্খ বন্যা!'

'লম্পট পশু চোর।'

'আমি তোমায় এখনি পুলিশে ধরিয়ে দেব এই গুঁড়োর খবর দিয়ে।'

'তার আগে মালা গোল ঘোরানো সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে পড়বে।'

'এসব করে কি হবে?' দাঁতে দাঁত ঘষে নীরদ প্রশ্ন করল।

'প্রতিশোধ। জান না মেয়েমানুষের গায়ের রক্তে আগুন ধরিয়ে সরে পড়তে চাইলে কাপুরুষ পুরুষের কি দশা হয়?'

'মূর্খ বন্যা!'

'অপদার্থ লম্পট!'

মালা অন্ধকারে সরে গেল।

নীরদ ঘরে চলে এল। টেবিলের ছোট্ট আলোটা জ্বাললে। পুরিয়া খুলে গুঁড়োটা পরীক্ষা করল। একবার নাকের কাছে নিল। তারপর চুপ করে ভাবতে লাগল। ভাবতে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করল সে। মালার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয় তবে কি সে আরো সাংঘাতিক না? অর্থাৎ আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে ও কি করে নীরদকে বিপদে ফেলবে। পুরুষকে বিপদে ফেলতে মেয়েরা কত কিছুর আশ্রয় নেয়।

নতুন করে নীরদের কপাল ঘামতে থাকে।

'আর যদি সন্দেহ সত্য হয়—'

'আমার মৃত্যুর জন্য নীরদ দায়ী কথাটা লিখে রেখে যেতে ওকে বাধা দিচ্ছে কে?'

তারপর? যেভাবেই মালা নিজেকে ধ্বংস করুক কাল ডেড বডি মর্গে চালান যাবে। তারপর? নীরদ কাঁপছিল কেঁদে ফেলল। দুঃখে নয় অনুশোচনায়, ভয়ে আতঙ্কে। কান খাড়া করে ধরল সে। যদি মালা সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে তার শব্দ হবে। হবে কি? হয়তো ইতিমধ্যে হয়েছে শব্দ নীরদ শুনতে পায়নি। কিন্তু তারপর? মালার নিচে পড়ার শব্দ সে শুনল কি শুনল না সেটা বড় কথা না—তারপর?

উত্তর খুঁজতে বা বলা যায় জীবনে এই প্রথম উপদেশ চাইতে নীরদ ঘাড় তুলে প্রতিমার দিকে তাকায়।

'উত্তর তোমার হাতে রয়েছে মূর্খ।' প্রতিমার দু চোখ ঘৃণার জ্বালায় ছোট হয়ে আছে। 'মালার কাছ থেকে তো উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছো, অত ভাবছ কি।'

তাই তো অত ভাবছে কি সে। হাতের বিষের পুরিয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল নীরদ। এবার প্রপাতের মতো তার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়ায়। যেন বিষ হাতে নিয়ে

তার কাঁদতে ভাল লাগছিল। দস্যু রত্নাকরের কথা নীরদের মনে পড়ে : অনুতাপের অশ্রু জলে পাপ ধুয়ে গেল। 'আমার যাবে কি? যদি সারারাত কাল সারাদিন বসে কাঁদি আমি পাপমুক্ত হব?'

'তা কি করে হবে। মালার শব মালার ভ্রূণ মর্গের রিপোর্ট মালার চিঠি এগুলোকে তুমি কি দিয়ে চাপা দেবে। এটা সত্য যুগ না। অপরাধ করলাম অনুতাপ করলাম আর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল। এখন আইন আছে পুলিশ আছে। সুতরাং—'

সেদিনের সেই নীরদ আজ আবার আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে এই নীরদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। নীরদ দু হাতে চোখ ঢাকল।

'আমি অনুতপ্ত, সত্যি আমি অনুতপ্ত, আমার দুষ্কৃতির জন্য আমি—' অস্থির হয়ে নীরদ পায়চারী করতে লাগল। 'কি করতে পারি রে খোকন।' অসহায় শিশুর মতো ছেলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নীরদ এক সময় প্রশ্ন করে। 'তুই বল খোকা, তুই আমায় বলে দে আমি কি করব?' গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বাবু ঘুমোচ্ছে। মশারীর ভিতর রোগা পাঁশুটে মুখটা দেখা যায়।

'আশ্চর্য! তুমি এখন একটা দুধের বাচ্চার কাছে পরামর্শ চাইছ?'

চমকে উঠল নীরদ। প্রতিমা কথা বলছে। প্রতিমা তিরস্কার করছে। কিন্তু দেখে নীরদ অবাক হল প্রতিমার চোখে ঘৃণার জ্বালা অনেকটা কমেছে, যেন নেই আর, সেখানে মমতা এসেছে সহানুভূতি জেগেছে।

'কি করতে পারি, কি করতে বলছ তুমি?' কাতর কণ্ঠে নীরদ প্রশ্ন করল।

'আমি তো তোমায় বলছিলাম, কথা শেষ করতে দিলে কই—তার আগেই তুমি তোমার বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে লেগে গেছ।'

'না না প্রতিমা, আমার বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে, আর যখনই আমার এই দশা হয়েছে তুমি কি আমায় উপদেশ দাও নি—বল বল কি করব?'

প্রতিমা হাসল। ওর বুদ্ধি উজ্জ্বল দুই চোখ হাসির ছটায় কত অপরূপ হয়ে ওঠে নীরদ আজ নতুন করে দেখল। ফটোটা একটু উঁচুতে টাঙ্গানো, না হলে নীরদ ওর চোখের পাতায় চুমো খেত।

'শোন।'

'কি?'

'খোকার বিছানার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে প্রতিমা আবার নীরদের চোখে চোখ রাখল।

'তোমার কোনো দোষ হবে না। তুমি তো আর নিজের হাতে দিচ্ছ না। ওর হরলিকস খাবার গ্লাশটায় একটুখানি গুঁড়ো ফেলে রাখো। কাল হরির মা এসে গ্লাশ ধুয়ে নিলেও একটু আধটু যা ওতে লেগে থাকবে তাতেই কাজ হবে। না, এমনিও ও বাঁচবে না। এভাবে নিরর্থক ওর বোঝা তোমাকে বইতে হচ্ছে দেখে আমার কত কষ্ট হয় তুমি জান?'

'প্রতিমা!' ভীত আড়ষ্ট নীরদ।

'আমি বলছি তোমার কোনো দোষ হবে না। তুমি তো আর নিজের হাতে খোকাকে তা দিচ্ছ না।'

'তারপর?' কাতর চোখে নীরদ স্ত্রীকে দেখল।

'চলে যাও মালাকে নিয়ে দূর সমুদ্রের ধারে কি নির্জন পাহাড়ের অরণ্যে। শুধু

তুমি আর ও সেখানে। আমি নেই খোকা নেই।'

'প্রতিমা!'

'হ্যাঁ সেখানেই সুখ অনন্ত সৌন্দর্য এবং সেটাই চিরকালের সত্য—সত্যকে অস্বীকার করা পাপ। আমি তোমার সহধর্মিনী হয়ে তোমাকে কি পাপ করতে দিতে পারি।'

'তুমি আমায় অনুমতি দিচ্ছ প্রতিমা?' প্রশ্ন করল নীরদ তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে সরে গেল। টেবিলের ওধার থেকে কাচের গ্লাশটা টেনে আনল।

'হ্যাঁ, থাক, আর ঢালতে হবে না। গ্লাশটা এভাবেই থাক।' পিছন থেকে প্রতিমা বলল, 'কাল সকালে হরির মা এলে তুমি ওকে মনে করিয়ে দিও আগে খোকাকে খেতে দিতে। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

গ্লাশে বিষ ছেড়ে দিয়ে নীরদ রাত্রির গাঢ়তা অনুমান করতে লাগল। আর তার হৃদপিণ্ডের শব্দ।

'মালা থাকবে, মালা ভোর রাত অবধি বেঁচে থাকবে ওর হাত থেকে বিষ কেড়ে নিয়ে এসে তুমি তা কি কাজে লাগাচ্ছ জেনে যেতে। সুতরাং—' ওপাশের দেয়াল থেকে প্রতিমা স্নিগ্ধ ক্ষীণ গলায় হেসে উঠল। প্রতিমার হাসি ও কথা নীরদ শুনল। কিন্তু আশ্চর্য আর সে সেদিকে তাকাতে পারছিল না, প্রতিমার দিকে তাকাবার সাহস তার এই মুহূর্তে চলে গেছে বলে মনে হল। কেন এমন হল, কেন কেন হঠাৎ—অস্থির অপ্রসন্ন মন নিয়ে নীরদ টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি খোকার বিছানার পাশে দাঁড়ায়। যেন ভয় পেয়েছে সে। যেন বিছানার ধারটা তার আশ্রয়। মশারীটা নড়ছে কি? 'না আমার চোখের ভুল।' বিড়বিড় করে উঠল নীরদ। আর সঙ্গে খোকা স্বপ্ন দেখে হাসল : 'বাবার সঙ্গে কাল চেঞ্জে চলে যাচ্ছি মালাদি, আমার বাবুর সঙ্গে।'

'বাবু! বাবু!' আর্ত অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে নীরদ খোকার বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ষোল

কালো ধুমসী বিড়ালটা খোকার বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল। মশারীর একদিক তোলা আর একদিক মেঝেয় লুটোচ্ছে। কোণা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু খোকা কই দাদাবাবু কোথায়। হরির মা ঘাড় ঘুরিয়ে নীরদের শূন্য বিছানা দেখল। টেবিল দেখল। আলনা দেখল। বাক্স দেখল। কোণায় ছাতাটা ঝুলছে। দাদাবাবুর বর্ষাতি ঝুলছে। আরো অনেক কাপড় চোপড়। আলমারীর নিচে জুতোগুলি পড়ে আছে।

বুড়ির কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল।

'রোগা ছেলেটাকে নিয়ে দাদাবাবু ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, নাকি রাত থাকতে উঠে চলে গেছে কোথাও!'

'খোকা, খোকন, সোনা আমার! দাদাবাবু!' যেন পাশের ঘরে আছে দুজন। 'বাপ বেটা ওখানে কি করছে? খোকা তো হাঁটতে পারে না, পাঁজাকোলা করে দাদাবাবু ওকে ওঘরে নিয়ে গেল কেন?'

বিড়বিড় করতে করতে বুড়ি দুটো পাল্লা ঠেলে পাশের কামরায় ঢুকল। জলের বালতি কুঁজো থালা গ্লাশ উনন কয়লা ঘুঁটে—ওধারে দাদাবাবুর খাবার ছোট টেবিল, চেয়ার,

চেয়ারের পিঠে শুকনো তোয়ালে! কিন্তু মানুষ কই। ওরা গেছে কোথায়? বুড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'মালা, মালাদি ওরা কোথায় গেল গো?'

'কারা?' হরির মার মুখের দিকে তাকিয়ে মালা প্রশ্ন করল, 'কাদের কথা বলছ?'

'আমাদের ঘরের খোকা, খোকার বাবা?'

মালার চেহারা এক রাত্রে বদলে গেছে। চোখের নিচে কালি। আলুথালু চুল। পরনের কাপড়টা বড় বেশি ময়লা। গায়ে ছেঁড়া ব্লাউজ। প্রায় লজ্জা নিবারণ হয় না এমন ছেঁড়া। অন্য সময় এবেশে মালাকে দেখলে হরির মা চমকে উঠত, দুঃখ করত, দুটো সহানুভূতির কথা বলত। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা তা না। কেবল হা করে মালার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে।

'তা ওরা দুজন গেছে কোথায় আমি কি করে বলব। আমি তো তোমাদের ঘরে যাই নি হরির মা, রাত্তিরেও না সকালেও না। সেই তো কাল দুপুরের দিকে বাবুকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। আমি কিছু জানি না আমি বলতে পারব না তোমাদের ঘরের খবর।'

কেমন যেন খাপছাড়া উত্তর, নাঁরস গলা, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। মালার কাছ থেকে বুড়ি এমনটা আশা করে নি। হা করে আর একটু সময় আপাদমস্তক মেয়েটাকে দেখে বুড়ি সিঁড়ির দিকে চলল। হা করে তাকিয়ে মালাও হরির মাকে দেখছিল। মালার চোখে রং নেই আগ্রহ নেই প্রশ্ন নেই ঔৎসুক্য নেই।

কি, অন্যদিন হলে এখনি একবার পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি দিত ও। আজ যেন দুমণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কে তার পায়ে। ইচ্ছা করলেও সেদিকে যেতে পারবে না। তাই চুপ করে বসে বাসন মাজতে লাগল। বাসন মাজতে লাগল আর ভাবতে লাগল। 'শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল নাঁরদ?' শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছা করল মালার। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। কিন্তু কিছুই করল না, বোবা শূন্য দৃষ্টি মেলে কলতলার সিমেন্টের শ্যাওলা দেখতে লাগল। বাসন মাজতে হাত সরছিল না। এত বাসন চাপিয়ে দিয়েছে আজ রমলা তার কাঁধে।

লালু মাথা চুলকায়। বুড়ি চোখ মোছে।

'জিনিসপত্তর সব পড়ে আছে। এসে দেখি সদর দরজাটা হা খোলা।'

লালু বলল, 'তাই তো কোথায় গেলেন নাঁরদবাবু।'

'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?'

'ডাক্তারবাবু আজ আসবেন কি? কাল তো যাবার সময় বলে গেলেন মাথা টিপটিপ করছে। হয়তো জ্বর হয়েছে হয়তো আজ আসবেনই না। বড়লোক মানুষ একটু অসুখ করলেই বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না, বুঝলে না হরির মা।' লালু মিষ্টি করে হাসল। কিন্তু হরির মার সে হাসি ভাল লাগল না।

'তবে এখন উপায়? আর কার কাছে আমি খোঁজ নেব ওরা কোথায় গেছে!' হরির মা নিজের মনে বকতে লাগল।

লালুর তাতে কান নেই। খাঁচার ভিতর ইঁদুর দুটোর ছুটোছুটি দেখছে। একটু পর যখন চোখ তুলল দেখল বুড়ির চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে।

'আসবে হয়তো বিকেলের দিকে। কোথাও যদি বেড়াতে টেড়াতে গিয়ে থাকে।' লালমোহন হরির মাকে সান্ত্বনা দেয়।

যেন বিশ্বাস করতে বাধছিল বুড়ির।

'দেখতে দেখতে রোদ কতটা চড়ে গেল। ধারে কাছে কোথাও যায় নি। তা হলে তো এইবেলা ফিরে আসত।' একবার থামল বুড়ি। তারপর আবার কাঁকিয়ে উঠল। 'রোগা ছেলেটাকে কি করে টেনে নিয়ে গেল গো, অ্যাঁ।'

বুড়ি দরজার কাছে সরে যেতে লালমোহনের কি একটা কথা মনে পড়ে।

'এই শোন হরির মা!'

হরির মা ঘাড় ফেরায়।

'তুমি ওপরে যাচ্ছ এখন?'

বুড়ি উত্তর দিতে পারল না।

লালু বলল, 'যদি ওপরে যাও খোঁজ নিও তো মালাদি কটা ইঁদুর মারল।'

'কিসের ইঁদুর, কেন, কি বলছিস তুই?' বুড়ির গলার ভিতর কেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

লালমোহন ফিক করে হাসল।

'দেখবে, দ্যাখো না গিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে একবার উঁকি দিয়ে, এমন জিনিস মালাদি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে!'

হাসিটা ভাল লাগল না কথাগুলো ভাল লাগল না হরির মার। ডিস্পেন্সারীর দরজা পার হয়ে রাস্তায় নামল। কিন্তু কোনদিকে যাবে? ডাইনে কি বাঁয়ে। চিন্তা করে বুড়ি ডাইনে হাঁটতে লাগল। তিনটে দোকানের পরে বনমালীর দোকান। নাঁরদের জন্য পান সিগারেট কিনতে হরির মাকে বলমালীর দোকানে রোজই দু তিনবার আসতে হয়। সেই সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠতা।

'হ্যাঁরে বনমালী, আমাদের বাবুকে তো দেখছি না।'

ছেলের বয়সী বনমালীও বুড়িকে মাসি ডাকে। বুড়ি কথা শুনে বনমালী একটু অবাক হল। 'সে কি কথা মাসি, তোমায় কিছু বলেনি বড়বাবু?'

বুড়ি ততোধিক অবাক হয়ে বনমালীকে দেখে।

'আমি তো সেই সাত সকালে পেয়ারাবাগান থেকে চলে আসি। আজ এসে দেখি ঘর খালি বিছানা খালি। খোকা নেই দাদাবাবু নেই।'

বিড়ি ধরিয়ে বনমালী কি ভাবল। যেন নিজের মনে বলল, 'এতকালের একটা লোক। আপন লোকের চেয়েও ঢের বেশি করেছে—জানিয়ে গেল না! বলে গেল না!'

'তুই জানিস নাকি বনমালী, তোকে বলে গেছে দাদাবাবু কোথায় গেছে?' বুড়ি চোখ বড় করল ঘনঘন নিশ্বাস ফেলল।

'এই তো ভোরবেলা চলে গেল। ট্যাক্সি থামিয়ে দু প্যাকেট সিগারেট দুটো দেশলাই নিয়ে গেল।'

'কোথায়?' বুড়ি কথা বলতে পারছিল না, যেন তার নিশ্বাস শব্দ করছিল প্রশ্ন করছিল।

'বলল রাত থাকতে বেরোতে হয়েছে ভোরের ট্রেন ধরবে বলে।' বনমালী বলল, 'হ্যাঁ, রাত তখন তিনটে হবে। ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে সিগারেট নিয়ে গেল।'

বুড়ি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। সেই যে মাথা নিচু করল মুখ নিচু করল আর তুলল না। হঠাৎ আঘাত পেলে মানুষের কি রকম চেহারা হয় যদি হরির মাকে তখন কেউ দেখত বুঝত। হাঁটতে পারছে না পায়ের জোর চলে গেছে। কোমরটা সোজা করতে পারছে

না। বাহান্ন বছর বয়সের হরির মা আজ যেন বিরাশী বছর বয়সে চলে এল।

বাড়ির সদর পার হয়ে ঘোরানো গোল সিঁড়িটার কাছে এসে বুড়ি অসহায় চোখে ওপরের দিকে তাকাল।

বুকের ব্যথাটা ডেলা পাকিয়ে এতক্ষণ শক্ত হয়ে ছিল। এবার গলতে আরম্ভ করল।

'খোকন, আমার সোনা।' ভাবতে গিয়ে এত বছর পর হরির মার মনে হল : না, যতই সে ওদের আপন করে দেখুক ওরা দেখেনি দেখতে পারে নি। ঝি দাসী। হরির মার সঙ্গে এর বেশি আমাদের সম্পর্ক নেই। তাই—তাই—

অনেক কষ্টে সিঁড়িগুলো ভেঙে বুড়ি দোতলার প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। 'তাই তো খোকা পাহাড়ের কথা বলত সমুদ্দুরের কথা বলত। এ্যাঁ, যাবার সময় তুই একবার বললিনে, বাবা মাসিকে বলে যাও। সকাল হোক—মাসি, এলে ঘর দরজা ওর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমরা রওনা হব।' নাকি খোকন খুব কাঁদাকাটা করেছিল এভাবে যেতে!

হতবুদ্ধি হয়ে একলা প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বুড়ি ভাবতে লাগল। তারপর এক পা এক পা করে আবার মালার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ডাকল, 'মালা! মালা!' উত্তর নেই। যেন যমপুরীর মতো নীরব হয়ে আছে এদিকের ঘর দরজা।

'না না আমি বলছি ওরা ঘরের চাবি কার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। এভাবে জিনিস-পত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে কেউ এত বেলায় বাইরে থাকে।'

চিৎকার শুনে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। কাঁদছিল ও, না ঘুমোচ্ছিল?

'তুমি আবার আমায় বিরক্ত করতে এসেছ। তোমার নীরদবাবু কি আমায় যাবার সময় বলে গেছেন যে আমি এসব কথার উত্তর দেব?'

বুড়ি চুপ করে রইল।

'তোমার চেয়ে আমি সুখী না হরির মা। এক কাড়ি বাসন মেজে আমার গা-পিঠ ব্যথা করছে। এখনি আবার বাচ্চা জাগবে। বাচ্চা আগলাতে হবে। তুমি কি জান না—যাও, তোমার পায়ে ধরি, আমায় বিরক্ত করো না, আমায় একটু ঘুমোতে দাও আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও—যাও—সরো—'

রুক্ষ বিকৃত কণ্ঠস্বর। যেন প্রকৃতস্থ নয় মালা। যেন তার কি একটা কঠিন অসুখ করেছে। অন্য সময় হলে হরির মা মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করত।

'যাও—সরো'—স্বরটা এত বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে বুড়ির বুকে এসে বিঁধল যে আর এক মুহূর্ত তার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। আস্তে আস্তে চলে এল ঘরে—নীরদের শূন্য ঘরে। শূন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করবে এখন ও। উনন ধরাবে? বাসন ধোবে? জল তুলবে? বাটনা বাটবে? কিন্তু কার জন্য কিসের জন্য। কারা খাবে? বুড়ি খোকার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মশারীর কোণাগুলো ছাড়িয়ে সেটা গুটিয়ে রাখল। রংচং-এ ছবির বইটা বিছানার এক পাশে খোলা পড়ে আছে সেটা বন্ধ করে শিয়রের ধারে রেখে দিল। তারপর? একটা বড় হাই তুলল হরির মা। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। সিমেন্টের ওপর বসে পড়ল। ওধারের দেয়ালে একটা কেমন ফর্‌র্‌ শব্দ শুনে বুড়ি চমকে সেদিকে চোখ ফেরাল। অন্য সময় হলে বুড়ি টিকটিকিটাকে তাড়া করে মুখের আরশোলাটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। খিলখিল করে হাসত খোকা। টিকটিকির মুখ থেকে আরশোলাকে বাঁচাতে হেই হুই শব্দ করে মাসির লাফালাফি আর দেয়ালে কিল মেরে থাবা

মেরে কি ঝাড়ন তুলে টিকটিকি তাড়াতে দেখলেই খোকা বলত : 'ওটা ওর খাদ্য মাসি। ওর জিনিস ও খাবে না?' শুনে বুড়ি বলত : 'তা হলেও তো বাবা চোখের ওপর এমন একটা অন্যায় দেখা যায় না সওয়া যায় না। তোর গায়ে জোর আছে বলে তুই ওর ঘাড় কামড়ে ধরবি। যা এখান থেকে—যাঃ যাঃ—পাপ!' আজ বুড়ি সেসব কিছুই বলল না। উঠল না নড়ল না। কেবল হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে আরশোলার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখল। এক সময় ছটফটানিও থামল। দুটো পাখা নীচে ঝরে পড়ল, মুণ্ডটা আর দু ফোঁটা রক্ত।

কটা বাজে এখন? বুড়ি জানালার দিকে ঘাড় ফেরায়। অন্য দিন খোকার শিয়রের দিকের জানালার গরাদের ছায়াগুলো দেখে ও বলতে পেরেছে নটা, সাড়ে ন, সাড়ে দশ, বারোটা, একটা। আজ গরাদের ছায়া দেখে বেলা আন্দাজ করার শক্তি তার লোপ পেয়েছে। সেই বোধ নেই। একটু একটু ঘুম পাচ্ছিল। পেটের ভিতরটা একেবারে খালি আছে বলে একটা কলকল শব্দ শুনল বুড়ি। শব্দ শুনে চমকে উঠল। এতটা বেলা হল, এক ফোঁটা চা গিলতে পারে নি, গেলার সময় হয়নি এবং মনেও ছিল না, এখন তার মনে পড়ল। দেড়টা বাজে? না না, দেড়টা কেন, দুটো বাজবে। বেলা দুটো থেকে আড়াইটের ওপর হরির মার বড় বেশি কড়া নজর। আজ সব বোধ তার চলে গেছে, অন্য সব কিছুর সময়ের চিহ্ন রং গন্ধ মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু বেলা দুটোর সময় খোকার দুধ গরম করে দেওয়ার কথাটা ঠিক মনে আছে। 'খোকা, খোকন রে—সোনা আমার।' বলতে বলতে বুড়ি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার পা কাঁপতে লাগল, মাথাটাও কেমন ঘুরছিল। জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ঢোক গিলতে পারল না। বড় তেষ্টা পেয়েছে। তাই। একটু জল খাই একটু জল তো আগে গিলে নিই। মনে করে, বুড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে কেমন মতিচ্ছন্নের মতো খোকার দুধ খাওয়ার, হরলিকস খাওয়ার গ্লাশটা হাতে তুলে নিল, তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে রান্না ঘরের দিকে চলল।

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বুড়ি ঢক ঢক করে প্রায় সবটা গিলে ফেলল। কিন্তু গেলার পর তার মনে হল জলের কোনো স্বাদ ছিল না, বরং যেন কেমন বিস্বাদই ঠেকেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি একটা ওয়াক তুলল। কিন্তু পেটের জল আর উঠে এল না। বুড়ি ভয় পেল। পেটটা জ্বলছে। কাঁচের গ্লাশটা হাত থেকে নামিয়ে রেখেছিল। কি মনে করে হাত বাড়িয়ে সেটা নাকের কাছে তুলতে গেছে যখন তখন তার হৃদপিণ্ড প্রচণ্ড শব্দ করে ওপর দিকে ধাক্কা দিল। কাঁচের গ্লাশ হাত থেকে ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল। সে সব দেখবার শক্তি ছিল না হরির মার। তার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। 'হরি—হরি—' আর খোকন না দাদাবাবু না, ভয় পেয়ে নিজের ছেলেকে ডাকতে চাইল বুড়ি—পারল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরল না। কেবল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। আর ঠিক সেই সময় ঠোঁটের পাশে দেখা দিয়েছে রক্ত। সিমেন্টের ওপর ছড়ানো কাচের ভাঙা টুকরোর ওপর বুড়ির শরীর ঢলে পড়ল।

আষাঢ়ের বেলা। যাই যাই করে কি আর যায়? ছটা বেজে গেছে। তখনও রোদের ঝিকিমিকি লেগে আছে গাছের মাথায় রাস্তার পাশের আলোর থামের গায়ে। মাঝারি ডিচের কাছে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। ব্রিজের ওপর উঠতে পারছে না, ট্রাফিকের চাপে রাস্তা বন্ধ। ট্যাক্সির পিছনের সীটে মাণিক আর মালা বসে আছে। আস্তে আস্তে কথা বলছিল দুজন।

'সত্যি আজ এক কথায় তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে আমি ভাবতে পারি নি।'

'সত্যি করে চেয়েছ বলেই এলাম।' মালা এতক্ষণ গম্ভীর ছিল এখন ক্ষীণ গলায় হাসল। 'চাওয়া সত্যিকারের হলে পাওয়া সহজ হয় তুমি কি জান না।'

মাণিক হাসল।

'তাই তাই না হলে কাল তোমার দাদা বৌদি যেমন কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল—অবশ্য গায়ে মাখিনি আমি সেসব কেননা এখানে ওরা দুজন তো কিছু নয়—এখানে তুমি আর আমি—কাজেই—' একটু থেমে মাণিক বলল, 'বলছ প্রফুল্লবাবু পরে মত পাল্টে তোমায় নিয়ে আসতে আজ আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু সে চিঠি তো আমি পাইনি—তার আগেই আমি আজ আবার ছুটে গেছি তোমাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায়। সত্যি কী ভীষণ ছটফট করছিল বুকের ভেতরটা আজ কদিন ধরে! আমি অনুতপ্ত মালা, আমি যে কত অনুতপ্ত!' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মাণিক মালার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

'আস্তে—আস্তে!' হাত ছাড়াল না মালা, চোখের ইসারায় ট্যাক্সি চালককে দেখিয়ে বলল, 'শুনতে পাবে।' তারপর মালা এক সময় বলল, 'অনুতাপ করা ভাল, অনুতাপ করলে মানুষের সব পাপ মুছে যায়।' বলে ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে গেল। আর মাণিক চোখের পলক না ফেলে মালার ঘাড়ের সুন্দর বাঁক ভুরুর রেখা দেখতে লাগল।

আর তখন উত্তর প্রদেশের এক উর্বর প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তুফান এক্সপ্রেস। একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় নীরদ ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। গদি আঁটা প্রশস্ত বেঞ্চির ওপর বিছানা করে বাবুকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবু এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, এখন চোখ মেলে বাবাকে দেখছে। ক্লান্ত বিমর্ষ নীরদ জানালার ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে দুবার ঘুমোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এখন সোজা হয়ে বসেছে। 'বাবু!' ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরদ হাসতে চেষ্টা করল।

'এবার কি মির্জাপুর স্টেশনে ট্রেন ধরবে বাবা।'

'আর একটু পরে।' কোলের ওপর টাইমটেবলটার গায়ে হাত বুলিয়ে নীরদ বলল, 'এখন আমরা—'

নীরদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাবু প্রশ্ন করল, 'পাহাড় দেখা যাচ্ছে বাবা?'

'হ্যাঁ ঐ তো পাহাড়।' জানালার বাইরে দিগন্তের নীলাভ বন্ধুর রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে নীরদ বলল, 'আমরা তো পাহাড়েই যাচ্ছি, কত সুন্দর কত বড় বড় পাহাড় দেখবে তুমি।'

শুনে বাবুর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিষ্প্রভ কোমল চোখ দুটো উত্তেজনায় আনন্দে একটু চকচক করে উঠল। আর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে নীরদ কি যেন ভাবল তারপর নুয়ে খোকার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, কেমন রে খোকন—বাবু?'

চোখ বুজে খোকা মাথা নাড়ল। তারপর চোখ খুলে বাবাকে দেখল। তারপর কি একটু ভেবে পরে এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'মাসিও আমায় খুব ভালবাসে, না বাবা?'

নীরদ মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, হরির মা—'

'মাসিকে কিন্তু বলে আসা হয়নি বাবা, হয়তো আমাদের জন্য ও খুব ভাবছে!'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে তো আগে পৌঁছুই। তারপর সেখান থেকে হরির মাকে

একটা চিঠি লিখে জানালেই হবে। তার জন্য চিন্তা কি।' নীরদ পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

কথা শেষ করে নীরদ যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল ঠিক তখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার মতন বাড়ির দরজার সামনে পুলিশের কালো গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

নীরদের রান্নাঘরের মেঝেয় হরির মার ঠাণ্ডা শক্ত শরীরটা আবিষ্কার করে নিচের ডিস্পেন্সারীর লালু—লালমোহন। শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে মালাদি কটা ইঁদুর মেরে রেখে গেছে দেখতে বুঝি চুপিচুপি ও ওপরে এসেছিল। এদিকের ফ্ল্যাটে কিছু না দেখে সে ওদিকের ফ্ল্যাটে—নীরদের ঘরে উঁকি দিয়েছিল। হরির মা এভাবে মরে পড়ে আছে দেখে ভয়ে লালু চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে রমলা। একটু আগে মাণিক এসেছিল মালাকে নিয়ে যেতে। দুজনকে জলখাবার খাইয়ে বিদায় করে দিয়ে হৃষ্টমনে বসে রমলা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। এমন সময় লালুর চিৎকার তার কানে যায়। সিমেন্টের ওপর ছড়ানো ভাঙা কাঁচের ওপর বুড়িকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে রমলাও আর্তনাদ করে উঠেছিল। তারপর বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি সে নিচে নেমে যায়। মোড়ের সেই লোহালক্কড়ের দোকানে উঠে রমলা ফোন করে প্রফুল্লর বৌবাজারের দোকানে খবর পাঠায়। প্রফুল্লর দোকানে টেলিফোন নেই। তাহলেও আপদে বিপদে যদি কখনও ডাকতে হয় এই জন্য প্রফুল্ল বহুদিন আগে পাশের দোকানের একটা ফোনের নম্বর রমলাকে দিয়ে রেখেছিল। রমলার ফোন পেয়ে প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে আসে। প্রফুল্ল আসতে আসতে নীরদের ফ্ল্যাটের দরজায় ভিড় জমে যায়। রাস্তার দু একজন লোকও কৌতূহলবশতঃ ওপরে উঠে আসে। নীরদ ও তার ছেলে সেই সকাল থেকে বাড়িতে নেই, এদিকে তার বিয়ের এই অবস্থা। পাড়ার দু চারজন মাতব্বর গোছের লোক প্রফুল্লকে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে পরামর্শ দিল। প্রফুল্ল তাই করল।

॥ সমাপ্ত ॥

নৈরাজ্যবাদ : প্রাচীন যুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

সভ্য জীবনের যাত্রাপথে কোথায় কেমন করে রাষ্ট্রশাসন, ধর্মব্যবস্থা ও ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জীবনে যে নানাবিধ বন্ধন আরোপ করেছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় প্রাচীন দার্শনিক ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সভ্যজীবনের বিধিনিষেধ ও ভেদবৈষম্যে ক্লিষ্ট ভাবুক মন কল্পনা করেছে এক প্রাগৈতিহাসিক স্বর্ণযুগের—যে যুগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে বাস করত, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসন এবং আর্থিক অসাম্য তাকে পীড়ন করে নি। চীন, ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার ভাবনায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল—সেখান থেকে এর বিস্তার হয় গ্রীস ও রোমে তারপর ক্রমশ সারা ইয়োরোপে। পিছনে ফেলে আসা এই সত্যযুগ হল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উচ্চারিত হল নিরাজ সমাজের বাণী—সভ্য সমাজের বন্ধন ও বেদনা কাটিয়ে ফিরে আসতে হবে আদিম জীবনের মুক্ত আনন্দে, আর এই প্রত্যাবর্তনের পথে বিলুপ্ত হবে রাষ্ট্র, ধর্মবিধান, ব্যক্তিসত্ব আর এদের আনুষঙ্গিক যা-কিছু অনুষ্ঠান, আইনকানুন, আচার-বিচার ও শাস্ত্রশাসন।

১। চীন : 'তাও'-এর পথ

সকল প্রকার বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল আড়াই বছর আগে চীনের 'তাও' মতবাদে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের বিচারে প্রাচ্য মনীষীদের কোন রাষ্ট্রদর্শন ছিল না, কারণ তাঁদের ধ্যানধারণায় রাষ্ট্রের স্থান ছিল গৌণ। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপর, জীবনের বাহ্য উপকরণের চেয়ে আন্তরিক সম্পদের উপর তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচী অন্তরমুখী, প্রতীচী বহির্মুখী, সুতরাং বহির্জীবনের নিয়ন্তা যে রাষ্ট্র তা প্রাচ্য সাধনার লক্ষ্য ছিল না। তা বলে একথা সত্য নয় যে প্রাচ্য মনীষায় রাষ্ট্রচিন্তা স্থান পায় নি। এঁরা স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রের বিচার করেছেন আর রায় দিয়েছেন যে, এ মানুষের বুদ্ধি দিয়ে গড়া একটি যন্ত্রবিশেষ—যা দ্বারা তার নিজেরই স্বাধীন বিকাশ খর্ব হচ্ছে। লাওৎসে ও ম্যাকিয়াভেলি উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের কাজকারবার স্বাভাবিক ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয় না। লাওৎসের মতে এটা দোষণীয় সুতরাং তিনি রাষ্ট্রের অবসান কামনা করেছেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে এটা সমর্থনীয়, রাষ্ট্রকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। পাশ্চাত্ত্য মতে লাওৎসের রাষ্ট্রবিচার দর্শনের পর্যায়ে পড়ে না কারণ তাঁর সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের বিলোপ। আর ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র-দার্শনিক, কারণ তিনি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রের মূল্য স্বীকার করলেই তবে সে চিন্তা রাষ্ট্রদর্শনের মর্যাদা পাবে এই ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

বস্তুত লাওৎসের ভাবনা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। রাষ্ট্র তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যও নয়। চীনের অধিবাসীরা স্বভাবত যে কোন প্রকার সরকারী শাসনের বিরোধী। অতি পুরাকাল থেকে সে দেশের গ্রাম অঞ্চলে এক স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম-

বৃদ্ধদের পরিচালনায়, সামাজিক বিধিব্যবস্থার অনুশাসনে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হত। কনফুসিয়াসের শিষ্য রাষ্ট্রবাদীরাও স্বীকার করেছেন যে যে-লোক রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সে শুচিতা বজায় রাখতে পারে না। মেন্‌সিয়াস স্বীকার করেছেন যে রাজত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের দুর্বলতা—তিনটি কাজে উঁচুদরের লোকেরা আনন্দ পায়—একটা রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া এ তিনের মধ্যে পড়ে না (৭/৫০/২০)।

আর সকল বিষয়েই লাওৎসে ও কনফুসিয়াসের মত বিপরীত। কনফুসিয়াস ছিলেন কনিষ্ঠ। দুজনেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের লোক। তখন চীনের বুকে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, জীবন ছিল অশান্তিতে ভরপুর, চিন্তাভাবনাও ছিল উচ্ছৃংখল। এই স্বেচ্ছাচার থেকে কনফুসিয়াস নিষ্কৃতি খুঁজলেন সামাজিক নীতি-বন্ধন ও ভদ্র আচরণে, আর লাওৎসে দেখালেন 'তাও'এর পথ—সকল রকমের নীতি ও আইনের বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির সহজ জীবনে ফিরে যাবার রাস্তা।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীনের চু রাজ্যে লাওৎসের জন্ম হয়। ইরানের জরথুস্ট্র, ভারতের মহাবীর ও বুদ্ধ এবং চীনের লাওৎসে ও কনফুসিয়াস—এশিয়ার এই কয়জন চিন্তানায়ক ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। লাওৎসে অর্থ 'বুড়ো দার্শনিক'। কথিত আছে যে তিনি মাথাভর্তি শাদা চুল ও ভারিক্কি চেহারা নিয়ে জন্মেছিলেন—তা থেকে তাঁর এই নামকরণ হয়। তাঁকে ঘিরে বহু উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরকালের জনসাধারণ ও রাজরাজন্যরা তাঁকে দেবতার সম্মান দিয়েছে। কিন্তু চীন তাঁর পথ গ্রহণ করেনি। সে কনফুসিয়াসের রাস্তাই বেছে নিয়েছে।

কর্মজীবনে লাওৎসে ছিলেন চাউ রাজ্যের মহাফেজখানার জিম্মাদার। অবসর নেবার পর তিনি দর্শনচর্চায় মন দেন। তাঁর চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে একাশিটি ছোট কবিতার একটি গুচ্ছে—এর নাম 'তাও তে চিং' বা 'পথের ঠিকানা'। এর বাণী অতি সহজ। মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যা আমরা সমাজের ও নীতির শাসন দিয়ে নষ্ট করেছি। ক্ষমতার লোভ, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, সভ্যতার আদবকায়দা ইত্যাদি এসে সহজ জীবনের মুক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। মানুষকে সেই আদিম মুক্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

> "কিছু করতে গেলেই ভণ্ডুল হবে;
> আঁকড়ে ধরলেই ফস্‌কে যাবে।
> জ্ঞানী কিছু করে না, তাই তার হাতে কিছু ভণ্ডুল হয় না,
> সে কিছু আঁকড়ে ধরে না, তাই কিছু ফসকায় না।" ৬৪[২]

তা বলে তাওবাদী সমাজের বাইরে গজদন্ত মিনারের চূড়ায় বাস করে না। সমাজে বাস করা স্বাভাবিক জৈব ধর্ম, তাও-এর পথও তাই। জ্ঞানী সমাজে বাস করে কিন্তু নিজেকে জাহির করে না, 'সাধারণ জনের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়', 'মাটিতে পা না দিয়ে হেঁটে যায়।'[১] কিছু না করে কিছু না বলে সে তার প্রভাব ছড়ায়। আপন নির্বিকার সত্তায় অবস্থান করে সে হয় অপরের অনুকরণীয়—তার মত প্রচারের অপেক্ষা রাখে না, প্রতিষ্ঠা কর্মের ওপর

---

১ প্রবন্ধের যাবতীয় উদ্ধৃতি লিন্-উটাং-"উইস্‌ডম্ অফ্ চায়না"স্থ লাওৎসে ও চুয়াংৎসের যে অনুবাদ করেছেন তা থেকে নেওয়া। সেখানে অন্য গ্রন্থের অনুবাদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সেখানে পাদটীকায় তার উল্লেখ আছে।

২ চুয়াংৎসের উক্তি—"এই মানব জগৎ"; লিন-উ-টাং, ৮৭ পৃষ্ঠা।

নির্ভর করে না।

"যে অন্যকে জানে সে বিশ্বান;
যে নিজেকে জানে সে জ্ঞানী।
যে অন্যকে জয় করে সে বলবান;
যে নিজেকে জয় করে সে শক্তিমান।" ৩৩

যে জ্ঞানী ও শক্তিমান তার প্রচারের প্রয়োজন নেই, জোর জবরদস্তির দরকার নেই। জ্ঞানীর পথ জীবের অন্তরের পথ। কৃত্রিম বন্ধন হতে মুক্তিকামী মানুষ প্রকৃতির সহজ পথ খুঁজবে। তাওবাদী তার স্বাভাবিক পথিকৃৎ।

"সে নিজেকে প্রকাশ করে না,
তাই সে ভাস্বর।
সে নিজেকে সমর্থন করে না,
তাই তার যশ দূরপ্রসারী।
তার অহঙ্কার নেই,
তাই সকলে তার গুণগ্রাহী।
তার দম্ভ নেই,
তাই সকলের মাথা তার কাছে অবনত।" ২২

আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব নিজের জন্য নয়, তাই তারা অনন্তকাল বিশ্বকে ধারণ করে আছে। তেমনি যে জ্ঞানী নিজের সত্তা ভুলে যায়, তার সত্তা চিরস্থায়ী হয়। যে নম্র সেই উন্নত, যে যত বিনয়ী সে তত মহান।

"সুতরাং যদি সকলের চেয়ে বড় হতে চাও,
সকলের নীচে এসে দাঁড়াও।
যদি সকলের আগে যেতে চাও,
সকলের পিছনে চল।" ৬৬

সমাজের নিয়মকানুনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থেকে যা-কিছু উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি। সভ্যতার চাপে পড়ে যা-কিছু সৎ ও শুভ তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিচারবুদ্ধি যখন হারিয়ে যায় তখনই আসে ধর্ম, ন্যায়, পরোপকার, সহবত—এই সমস্ত কথার জাল বুনে সমাজকে ধরে রাখবার চেষ্টা হয়। জ্ঞান না থাকলেই পুঁথির বিদ্যা এসে আসর জমায়।

"নিজের চৌকাঠ না পেরিয়ে
জানা যায় সারা দুনিয়ার খবর।
নিজের জানলার বাইরে না তাকিয়ে।
দেখা যায় আকাশজোড়া 'তাও'।
যতই জ্ঞানের পিছনে ছুটবে
ততই জানবে কম।" ৪৭

উড়িয়ে দাও বিদ্যা, বিচার ও সহবত—ফিরে আসবে মানুষের জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও সততা।

"সহজ সত্তায় ফিরে যাও,
আদিম প্রকৃতিকে মেলে ধর
স্বার্থচিন্তা দূর কর,
আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হও।" ১৯

হুশি লাওৎসের চিন্তাধারাকে 'দার্শনিক শূন্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন।[৫] লেগির মতে তাঁর নিবৃত্তিবাদ প্রগতির নিয়মসহ নয়,—ব্যক্তির ও সমাজের ধর্ম এগিয়ে যাওয়া, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা নয়।[৬] এঁরা লাওৎসের প্রতি সুবিচার করেননি। তাঁর মত নেতিবাচক হলেও শূন্যতা ও স্থাণুতার পরিপোষক নয়। দম্ভ ও কৃত্রিমতাকে, বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে মানুষের ভাল করার স্পর্ধাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, তিরস্কার করেছেন। সরল ও নম্রভাবে, অপরের ওপর জুলুম না করে, নিজ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে যে কাজ হয় প্রগতিবাদীদের চাঞ্চল্যে তা হয় না। অতিবিস্তার ও অতিবৃদ্ধি প্রগতি নয়, পতনের প্রস্তুতি। গাছ বেশী বাড়লে তাকে কাটা হয়, ধনুক বেশী নোয়ালে তা ভেঙে যায়, তলোয়ারে বেশী শান দিলে তার ধার ক্ষয় হয়, বেশী ধন সঞ্চিত হলে তা আর ধরে রাখা যায় না। সুতরাং

"যার ক্ষমতা চূর্ণ করতে হবে
তাকে আগে বাড়তে দাও।
যাকে দুর্বল করতে হবে
তাকে বলবান হতে দাও।
যাকে মাটিতে শোয়াতে হবে
তাকে আকাশে উঠতে দাও।" ৩৬

অতএব

"অসন্তোষের বাড়া অভিশাপ নেই
অধিকারবৃত্তির বাড়া পাপ নেই।" ৪৬

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে এর গোড়ায়ই গরমিল। জীবন ভোগ ও বিস্তারের জন্যে, নিবৃত্তির জন্যে নয়, তার পরিণামে যদি থাকে বিনাশ ও মৃত্যু থাক ক্ষতি নেই। এরিস্টটল-এর সময় থেকে এই ইষ্টমন্ত্র ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত এবং রেনেসাঁস-এর সময় থেকে 'মানবধর্ম' বলে সম্বর্ধিত হয়ে এসেছে। লাওৎসে এঁদের কথার জবাবে বলবেন যাকে তুমি জীবনের গতি ও বিস্তার বলছ সে এক গোলকধাঁধার মধ্যে অবিরাম ঘুরে মরা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থ ও ক্ষমতার সুখ যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে ধর্ম ও কর্তব্যের কথা আসে কেন? আসলে জীবনের বিস্তারে ধর্মের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে চলেছে ভুল পথে। "বাতাস যেমন যেদিকে খুশী বয়, তেমন ধর্মও খুশীমত নিজেকে স্থাপন করুক। এত হৈ চৈ করে তার সন্ধান করা কেন, যেন ঢাক বাজিয়ে এক পলাতক আসামীর খোঁজ হচ্ছে?"[৭] প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলে, সকল বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ছাপিয়ে তার নিয়মই বহাল থাকবে। "রাজহাঁসকে রোজ স্নান না করালেও সে শাদাই থাকে আর কাকের গায় রোজ কালি না লাগালেও সে কালই থাকে।[৮] সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হল খোদার ওপর খোদকারী না করে নিয়মগুলোকে জানা এবং জীবনকে সেই নিয়মমাফিক পরিচালনা করা। "মানুষকে শাসন করা ভগবানের কাজ", মানুষের নয়।

সুতরাং সেই সরকারই ধন্য যার কোন শাসন নেই। সেই যথার্থ প্রভু যে প্রভুত্ব করে না।

---

[৫] ফিলসফি—ঈস্ট এণ্ড ওয়েস্ট, সম্পাদক; চার্লস এ মুর, নিউ জার্সী, ১৯৪৬, ২০৮ পৃষ্ঠা।
[৬] দি টেকস্টস অব তাওইজম—সেক্রেড বুক্স্ অব্ দি ঈস্ট, ৩৯ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।
[৭] লাওৎসের শিষ্য চুয়াংৎসে তাঁর গুরু ও কনফুসিয়াসের মধ্যে একটি তর্কের অবতারণা করে সেই প্রসঙ্গে লাওৎসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এইচ. এ. গাইলস্ : চুয়াংৎসে, মিস্টিক, মরালিস্ট এণ্ড সোস্যাল রিফর্মার, লণ্ডন ১৮৮৯, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

"যারা শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা
লোকে এইমাত্র জানে যে তারা আছে;
যারা এর চেয়ে নিকৃষ্ট তাদের লোকে ভালবাসে, স্তুতি করে;
আরো নিকৃষ্টদের তারা ভয় করে;
সবচেয়ে যারা অধম তাদের তারা গালাগালি করে।" ১৭

কোন সরকার কখনও মানুষকে সুখী করতে কিংবা সাধু বানাতে পারে না। সরকার মানুষকে কেবল নষ্টই করে এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, দুর্বুদ্ধি ও অসন্তোষ ছড়ায়।

"যতই বিধিনিষেধ বাড়বে ততই মানুষ হবে গরীব।
যত ধারাল হাতিয়ার বানাবে
রাজ্যে তত বাড়বে বিশৃঙ্খলা।
যত কলকৌশল ফাঁদবে
তত বেরুবে তাকে এড়াবার ফন্দি।
যে দেশে যত আইনকানুন,
সে দেশে তত চোরডাকাতের মেলা।" ৫৭

দুনিয়াকে বাহুবলে জয় করে ভোগ করার ব্যাপারেও দেখা যায় একই হেঁয়ালি। লাওৎসে শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী, কিন্তু বিশ্বপ্রেম অথবা কোন মহৎ আদর্শের জন্যে নয়। 'তাও' প্রকৃতির পথ, এতে মানবিক আদর্শের জায়গা নেই। লাওৎসে যুদ্ধকে ঘৃণা করেন এর নাশকতা ও বিফলতার জন্য।

"কারণ এ জিনিস পিছন দিকেও আঘাত হানে।
সৈন্যরা যেখানে যায় সেখানে বাড়ে কাঁটাগাছের জঙ্গল।
একটা বিপুল বাহিনী সংগ্রহ কর
পরের বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।" ৩০

অস্ত্র ও আইন দিয়ে শাসন চলে না। শাসনহীন নিরাজ সমাজ ঠিক পথে চলবে। লাওৎসে বলেছেন, "জনসাধারণ একটি শিশু।" কনফুসিয়াসও মানবেন একথা, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। তিনি বলবেন শিশু যেমন বাপমার হাতে গড়ে ওঠে তেমনি জনসাধারণকে গড়ে তুলবেন শাসক ও নেতৃবৃন্দ। লাওৎসে বলবেন,—শিশুর মত জনসাধারণকে তার স্বভাব মাফিক বাড়তে দাও, তার ওপর কারিকুরি করতে গেলে তার সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হবে।

"ছোট মাছকে যেমন করে ভাজে বড় দেশকে তেমন করে শাসন করতে হয়।" ৬০ মাছটাকে নাড়াচাড়া করলে গলে কাদা হয়ে যাবে, তাকে অল্প আঁচে কড়ার ওপর ছেড়ে রাখতে হয়। এই হচ্ছে তাও-এর নিষ্ক্রিয় শান্তির পথ। "পৃথিবীটা ঈশ্বরের পাত্র। মানুষ তা গড়তে পারে না।"২৯

* * *

লাওৎসের প্রায় আড়াই শ' বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে তাঁর মতের ব্যাখ্যান ও বিস্তার করেন তাঁর ভক্ত চুয়াংৎসে। সে আর এক অরাজকতার যুগ। চাউ সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম দশা। সামন্তরাজারা নামে মাত্র চাউ বংশের প্রতি আনুগত্য কবুল করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। দর্শনের রাজ্যেও বাক্‌বিতণ্ডার ঝড়। চারদিকের দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে চুয়াংৎসে নিয়ে এলেন এক অবিশ্বাসী নেতিবাচক মতবাদ। গাইল্‌স্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে ছোকরার দল তাঁর কাছে ঘেঁষত না কারণ

তাঁর বই পড়ে আমলাতন্ত্রের গদিতে বসবার পরীক্ষাগুলি পাশ করা যেত না। তাঁর বই পড়ত বুড়োর দল—যারা কর্মক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারেনি কিংবা কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছে অথবা যাদের ধর্মকর্মে মতি হয়েছে, পরলোক সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মেছে।*

কনফুসিয়াসের মত প্রচারে মেনসিয়াসের যা অবদান লাওৎসের মত জনপ্রিয় করার জন্যে চুয়াংৎসে তার চেয়ে অধিক কীর্তি রেখে গেছেন। তিনি কেবল গুরুর মতের ব্যাখ্যান করেননি, গুরুর দর্শনকে নূতন ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনাগুলি উপকথা ও বাক্যালাপের আকারে সংকলিত হয়েছে। এদের যেমন ধার তেমন ভার। কনফুসিয় রাষ্ট্র ও নৈতিক শাসনকে তিনি কঠোর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। তাঁর মূলমন্ত্র লাওৎসের বাণী—সকল রকম কৃত্রিমতা ছেড়ে স্বভাবের অবস্থায় ফিরে যাও। স্বাভাবিক ও কৃত্রিমের তফাৎ বোঝা কঠিন নয়।

"ঘোড়া ও ষাঁড়ের চারটি করে পা আছে—এটা স্বাভাবিক। ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগালে, ষাঁড়ের নাকে দড়ি ঢোকালে—এটা কৃত্রিম" (শারদ বন্যা)

যা কিছু মূল্যবোধ, আচার আচরণের বিধান, সব অর্থহীন ও কৃত্রিম। রূপ, নীতি, বুদ্ধি, ধর্ম এই সকল মিথ্যার মোহে মানুষের বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়, ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ বোধ এর অসারতা যে রূঢ় অবিশ্বাসের সঙ্গে চুয়াংৎসে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তা ম্যাক্‌স্ স্টার্নারকেও হার মানায়।

"মানুষ খায় পশুমাংস, হরিণ খায় ঘাস, কাঁকড়াবিছার খাদ্য পোকামাকড় আর পেঁচা ও কাক ভালবাসে ইঁদুর। এই চারের মধ্যে কার রুচিটা ভাল? বানরের প্রিয় হল কুকুরমুখী বানরী, হরিণ ছোটে হরিণীর পিছনে, মাছ মৎসিনীর প্রতি আসক্ত। আর মানুষ মুগ্ধ মাও চিং ও লি চির রূপে, যাদের দেখলে মাছ গভীর জলে ডুব দেবে, পাখি আকাশে উড়বে, হরিণ ছুটে পালাবে। কে বলবে কার রূপটা খাঁটি?" (সকল বস্তুর সমীকরণ)

শহীদ হয়ে মর আর ডাকাত হয়ে মর, মরণ যা তাই। পো য়ি নূতন রাজবংশের গোলামি করতে অস্বীকার করে শুয়িয়াং পাহাড়ের তলায় মৃত্যুবরণ করেছিল। দসু চে ডাকাতির অপরাধে তুংলিং পর্বতের নীচে প্রাণ দিয়েছিল। উভয়ের কর্ম ছিল পৃথক কিন্তু কর্মফল হল এক।

"তবে কেন আমরা প্রথমকে বাহবা আর শ্বিতীয়কে ধিক্কার দিই? সকলকেই কোন কারণে মরতে হয়। তবু যে দয়া ও কর্তব্যের নামে মরে সে হল সাধু, আর যে স্বার্থের জন্যে মরে তাকে সবাই বলে নীচ!" (পায়ের জোড়া আঙুল)

সমাজে চলতি নীতিকথাগুলি ধাপ্পাবাজি, ব্যক্তিকে বিকৃত করে ও দাবিয়ে রাখবার ফন্দি। বুদ্ধি ও চালাকি'ত বদমায়েসের হাতিয়ার। চোরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা বুদ্ধি করে ট্রাঙ্কে তালা লাগাই, বস্তায় দড়ি বাঁধি। কিন্তু যখন বলবান চোর মালপত্র সুদ্ধ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে পালায় তখন সেই তালা আর হুড়কা তারই কাজে লাগে এবং তার ভয় হয় বুঝিবা তালা খুলে গেল।

"সুতরাং দুনিয়া যাকে বলে বুদ্ধি তা কি শুদ্ধ চোরের সুবিধার জন্যই নয়?" (ট্রাঙ্ক খোলা)

---

* চুয়াংৎসে : ভূমিকা, ১৪ পৃষ্ঠা।

চি রাজ্যে ছিল পণ্ডিতদের গড়া আইন-কানুনের শাসন। তবু একদিন প্রাতঃকালে তিয়েন চেংৎসে চির রাজাকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য চুরি করলেন। শুধু রাজ্য নয়, পণ্ডিতদের বুদ্ধির খেলা আইনকানুনগুলিও হল তাঁর। সুতরাং চোর বলে খ্যাতিলাভ করলেও তিয়েন চেংৎসে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন কাটিয়ে গেলেন।

অতএব পণ্ডিতের ধর্ম অধর্মের দান। ডাকাত পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্র মেনে চলে। দসু চে তার সাকরেদকে বলছে :

> "পণ্ডিতদের কীর্তিত গুণেপনা চোরের মধ্যেও আছে, যেমন ধনসম্পদের সন্ধান নেওয়ার বুদ্ধি, বিপদের মুখে এগিয়ে যাবার সাহস, সকলের শেষে বেরিয়ে আসার বীরত্ব, ধরা না পড়ার সতর্কতা, লুঠের মাল সমান ভাগে বণ্টন করার সহৃদয়তা। এই পাঁচটি গুণ ব্যতিরেকে কোন দসু বড় হতে পারে নি।" (ট্রোক্ক খোলা)

সুতরাং পণ্ডিতদের শিক্ষা নিয়েই দসু চে তার ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে। পণ্ডিতদের তাড়াও, দসুরা অমনি পালাবে। রাজ্য শাসনের জন্যে পণ্ডিতদের সংখ্যা বাড়াও, দসু চে'র মুনাফার অঙ্ক ডবল হবে।

> "একটা আংটি চুরি করলে চোর বলে তোমার ফাঁসি হবে। একটা দেশ চুরি করলে তুমি হবে রাজা। দয়াধর্মের যা কিছু শিক্ষা তা থাকে রাজার হেফাজতে। তা হলে কি একথা সত্য নয় যে রাজারা দয়াধর্ম ও পণ্ডিতদের নীতি কথার চোর?" (ট্রোক্ক খোলা)

চুয়াংৎসে পণ্ডিতদের নিয়ে কিভাবে ঠাট্টা তামাসা করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত দসু চে-র সঙ্গে কনফুসিয়াসের সাক্ষাতের গল্প। দসু চে-র দাদা লিউ সিয়া হুই ছিলেন কনফুসিয়াসের বন্ধু। তাঁর উপদেশ অমান্য করে কনফুসিয়াস দসুর কাছে গেলেন তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে সৎপথে আনবেন বলে। অনেকগুলি স্তুতিবাক্য বলে তিনি কিছু ধর্মোপদেশ দিলেন এবং দসুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে একজন রাজর্ষি হবার জন্যে তাকে অনুরোধ করলেন। এমনও আশ্বাস দিলেন যে এই পরিবর্তন সুসম্পন্ন করবার জন্যে তার সাহায্যের অভাব হবে না। দসু প্রথমে একটি প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করল—"যারা সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের প্রশংসা করে, তারা আড়ালে গেলে গালাগালি করে।" তারপর সে নিজের দর্শনের একটা ফিরিস্তি দিল :

> "আকাশ ও পৃথিবীর সীমা নেই—আর মানুষের মিয়াদ বাঁধা। অসীমের মাঝখানে একটুকরো সময়ের গণ্ডিতে সে আবদ্ধ হয়ে আছে। একটি মাত্র মুহূর্ত আর সব শেষ, যেন একটা ফুটো দিয়ে দেখা দৌড়ে যাওয়া রেসের ঘোড়া। যে এই মুহূর্তটিকে তার ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে সেই ঠিক রাস্তা চিনেছে।"

এর পর প্রশংসাবাণীর প্রত্যুত্তরে

> "শাদা আংরাখার ওপর কাজকরা ষাঁড়ের চামড়ার কোমরবন্ধ চাপিয়ে তুমি সেজেছ মন্দ নয়। আর ধাপ্পাবাজির বুলি দিয়ে রাজারাজড়াদের ঠকিয়ে তুমি বেশ ধনসম্মান আদায় করছ। আসলে তুমি ওরাই ফিকিরে আছ। তোমার চেয়ে বড় ডাকাত আর নেই। আমি অবাক্ হই লোকের মুখে মুখে দসু চে-র কথা, কিন্তু তারা কেন তোমাকে দসু কনফুসিয়াস বলে না!"

তারপর আগন্তুককে ভদ্রভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই মুহূর্তে বিদায় না নিলে তার মেটে দিয়ে দসুদলের সকাল বেলার ঝোল রান্না হবে। কনফুসিয়াস পালিয়ে বাঁচলেন এবং ফিরে এসে বন্ধু লিউ সিয়া হুইকে বললেন, "আমি বাঘের মাথায় হাত বুলাতে আর তার দাড়ি আঁচড়াতে গিয়েছিলাম। আর একটু হলে তার মুখের ভেতর গিয়ে পড়েছিলাম আর কি?"[৭]

এমন মনে করবার কোন কারণ নেই যে দসুর মুখ দিয়ে চুয়াংৎসে যা বলিয়েছেন তা তাঁর নিজের কথা। তিনি ভোগবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিতাচার ও আত্মসন্তোষে বিশ্বাসী। শুধু পণ্ডিতপ্রবরকে হাস্যাস্পদ করবার জন্যে এই গল্প ও কথার অবতারণা।

দেশে দেশে কালে কালে প্রকৃতিবাদী স্বপ্নবিলাসীরা এক অতিপ্রাচীন স্বভাবশুদ্ধ সমাজের কল্পনা করেছেন। চুয়াংৎসেও এঁকেছেন প্রকৃতির কোলের এই শান্তসুন্দর রাজ্যের ছবি যেখানে মানুষ ছিল সহজ সরল ধীর ও স্থির।

> "মানুষ পশুপাখির সঙ্গে বাস করত এবং তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। ভদ্রলোক ও ইতরলোকের তফাৎ কেমন করে জানা যাবে? কারও কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না কাজেই তাদের স্বভাবধর্ম বিকৃত হতে পারত না। কারও কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না কাজেই তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সততা ছিল, তাদের প্রকৃতি তারা হারায় নি।
>
> তারপর যখন পণ্ডিতরা এলেন, মিনমিন করে দয়াদাক্ষিণ্য ও নীতিকথার উপদেশ শোনাতে লাগলেন তখন থেকে মানুষের মনে ধোঁকা লাগল, সন্দেহের উদয় হল।...তাও-এর ধর্ম যদি নষ্ট না হয় তাহলে দয়াদাক্ষিণ্য ও নীতিকথার দরকার কি? মানুষের স্বাভাবিক আনন্দের উৎস যদি শুকিয়ে না যায় তা হলে গানবাজনা ও উৎসবের প্রয়োজন কি? পাঁচটা রং যদি দুনিয়ায় টিকে থাকে তা হলে আবার রঙের সাজ কেন? পাঁচটা সুর যখন কানে বাজে তখন ছয় গর্তের বাঁশি কি কেউ বাজায়?...সেই থেকে এল লোভ, লোভের জন্যে শরীরপাত, পরস্পরে ঝগড়া আর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা—যার কোন শেষ নেই।" (ঘোড়ার খুর)

সভ্যতায় এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নেই। একমাত্র উপায় এই সভ্যতাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। ধর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি, নীতিকথা, বিত্ত সব ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারলে তবেই মানুষের মুক্তি।

> "দূর কর জ্ঞান, ঝেড়ে ফেল বিদ্যা, তবেই ডাকাতরা থামবে। ফেলে দাও মণিমুক্তা, চোরদের কাজ বন্ধ হবে।...গজকাঠিগুলো টুকরো টুকরো করে ফেল, দাড়িপাল্লা গুঁড়িয়ে দাও, জিনিসের পরিমাণ নিয়ে লোক মারামারি করবে না। পণ্ডিতদের সব কিছু অনুষ্ঠান মাড়িয়ে ফেল, লোকে তখন তাও-এর কথা ভাবতে শিখবে। ৎসেং আর শি-র কাজ থামাও, য়িয়াং চু আর মৎসের মুখ সেলাই করে দাও, দয়াধর্ম ও নীতিকথা বর্জন কর তখন মানুষের ধর্ম ঠিক পথে চলবে।" (ট্রোক্ক খোলা)

পৃথিবীর যাবতীয় বাস্তব ও নৈতিক বন্ধন হতে মুক্ত হলে মানুষ সেই পরম পথ খুঁজে পাবে, প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবার পথ।

> "তুমি কর্ম ত্যাগ কর, দুনিয়া আপনিই শোধরাবে। দেহকে ভুলে যাও, বুদ্ধি-

[৭] আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট ইন এনসিয়াণ্ট চায়না, লণ্ডন, ১৯৩৯। ৩৯-৪৬ পৃষ্ঠা।

শুদ্ধি উগরে ফেল। সমস্ত পার্থক্য উপেক্ষা করে অনন্তের সঙ্গে এক হও। মনকে ছেড়ে দাও, অন্তর মুক্ত কর। শূন্য হও, হও আত্মভোলা। সব মূলদেশে ফিরে আসবে, সেখান থেকে জীবনের রস আহরণ করবে।" (সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে)

চুয়াংৎসের বর্ণিত মুক্ত আত্মার এই শান্ত স্থিত অচলপ্রতিষ্ঠ অবস্থা কতকটা বুদ্ধের নির্বাণ ও বেদান্তের মোক্ষের মত। অবশ্য এ পথ সাধারণ লোকের নয়। তার জন্যে চুয়াংৎসের বিধান অতি সহজ—

"একটা গাছের গায় হেলান দিয়ে গান গাও; কিংবা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়।" (অঙ্গবিকৃতি)

'তাও' ভুলে গেলে যেমন আসে কর্তব্য ও নিয়মকানুনের কথা, তেমনি স্বভাবসত্তা হারিয়ে গেলে হাজির হয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংশয় ও বিশৃঙ্খলার সূচনা করে।

"যদি তাদের স্বভাব বিকৃত না হয়, যদি তাদের চরিত্র দূষিত না হয়, তা হলে শাসনের কী প্রয়োজন?" (সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে)

আইন ও শাসনের জোরে লোককে ভাল করার মত হঠকারিতা আর নেই। মানুষের যেমন ভুলভ্রান্তি আছে, তাদের ভাল করবার দায়িত্ব নেয় যে আইন ও সরকার, তারাও কিছু কম ভুলচুক করে না।

"ঠিক-এর বিপরীত ভুল, সুশাসনের বিপরীত কুশাসন। যারা বলে ভুলকে বাদ দিয়ে ঠিককে নেব, কুশাসনকে বাদ দিয়ে সুশাসনকে রাখব—তারা বিশ্বের নিয়ম জানে না, সৃষ্টির রহস্য বোঝে না। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশের কথা বলা, হাঁ-কে ছেড়ে না-র কথা ভাবা সমান অবাস্তব।" (শারদ বন্যা)

সুতরাং একমাত্র সুশাসন হল অশাসন (উ-উই)। সরকার যদি মানুষের জীবনযাত্রায় হাত না দেয় তা হলে তারা আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে। জ্ঞানী রাজা ক্ষমতার জোরে শাসন করেন না, তিনি নিজে শুদ্ধ হয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রজাদের প্রভাবিত করেন।

চীনের সে সময়কার রাজনৈতিক দুর্দশা ও দার্শনিকদের ওপর তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিচার করলে চুয়াংৎসের নৈরাজ্যবাদী মতগুলি বুঝতে সহজ হবে। তখন চাউ সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের সংবিধান এক কায়াহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়েছিল। রাজনীতির আবহাওয়া ক্ষমতার লড়াই ও ষড়যন্ত্রে দূষিত। এই আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা মেনসিয়াস ও রক্ষণশীলদের ছিল না। তাঁরা একটি মহান আদর্শের আশ্রয় নিলেন,—ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে রাজা ও পণ্ডিতেরা 'জেন'-এর শাসন বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। সুশাসিত ধর্মরাজ্যের কর্তব্য হবে কুশাসিত দুষ্ট রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া। সাম্রাজ্যসন্ধী কুচক্রী রাজাদের স্বার্থসিদ্ধিতে এই মতবাদ বেশ কাজে লাগল। ছোট্ট রাজ্য সুং ধর্মরাজ্যের আদর্শের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেনসিয়াসের ন্যায় আদর্শবাদীদের বিশ্বাস যদি সত্য হত তা হলে অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে স্বাভাবিক হত সুং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তা হওয়া দূরে থাকুক সুং-এর উন্নতি দুই শক্তিমান রাজ্য চি ও চু-র গাত্রদাহের কারণ হল। অবশেষে সুং-এর বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার করে চি রাজ্য তাকে গ্রাস করল। এ অপকর্মের নীরব সমর্থক ছিলেন মেনসিয়াস। তাঁর এক সন্দিগ্ধ শিষ্য তাঁকে এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। গুরু জবাব দিয়েছিলেন—সুং যে অন্যান্য রাজ্যের সমর্থন পায় নি এ থেকেই বোঝা যায় যে তার শাসন ধর্মসম্মত ছিল না![৮]

[৮] আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ১৪২ পৃষ্ঠা।

এই প্রকারে কনফুসিয়াসের দর্শন হয়ে দাঁড়াল তথাকথিত 'ধর্মযুদ্ধ' এবং 'দুষ্টের দমনের সংগ্রাম'-এর ওকালতি। অবশ্য একটা শর্ত ছিল যে 'যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হয়ে কাজ করবার যোগ্য' শুদ্ধ তারাই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এ যোগ্যতার বিচার করবে কে? অবশ্যই ধর্মযোদ্ধা স্বয়ং। সুতরাং রাজাদের বুঝিয়ে সুপথে আনতে পারলেই তাদের মারফৎ জনসাধারণকে সুখী ও পুণ্যবান করা যাবে কনফুসিয়াসের এই শিশুসুলভ সরল বিশ্বাস চুয়াংৎসের তামাসার খোরাক হল আর রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা ও পণ্ডিতের নীতিবাগীশতার বিরুদ্ধে তীব্র অবিশ্বাস সৃষ্টি করল।

তরুণ বয়সে চুয়াংৎসে সরকারী চাকরি করতেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রের সকল সংশ্রব ত্যাগ করে তিনি টলস্টয়ের মত নিরালায় জীবন যাপন করেন। ভাল ভাল পদের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি দারিদ্র্য ও মুক্তির জীবন বেছে নেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের চীন-ঐতিহাসিক সু মা চিয়েন এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। চু রাজ্যের রাজা উই দামী দামী উপহার দিয়ে দূত পাঠালেন তাঁকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে। চুয়াংৎসে মৃদু হেসে দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"তুমি কি কখনও বলির ষাঁড় দেখ নি? বছর কয়েক খাইয়ে মোটা করে যখন তাকে সুন্দর সাজ পরিয়ে হাড়িকাঠের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে চাইবে না একটা কাদায় গড়ানো শুয়োর ছানার সঙ্গে তার অবস্থার বদল করতে? —বেরিয়ে যাও! আমাকে অপবিত্র কোর না! রাজশাসনের দাস হবার চেয়ে আমি বরং নিজের খুশীমত কাদায় গড়াব।[৯]

এ-ধরনের আর একটি গল্প আছে। চুয়াংৎসে লিয়াং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হুয়েংৎসে-র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। কোন একজন গিয়ে তাঁকে লাগাল যে চুয়াংৎসের অভিসন্ধি প্রধান মন্ত্রী হওয়া এবং তিনি সেই মতলবে এদিকে আসছেন। হুয়েংৎসে ঘাবড়ে গিয়ে সারা দেশে তাঁর খোঁজে লোক লাগালেন। শেষে চুয়াংৎসে নিজেই হাজির হয়ে প্রধান মন্ত্রীর আচরণ একটি উপমা দিয়ে বর্ণনা করলেন।

"দক্ষিণ দেশে এক রকম পাখি আছে—তার নাম স্বর্গীয় পাখি। যখন সে আকাশ-পথে দক্ষিণ সাগর থেকে উত্তর সাগরে পাড়ি দেয় তখন উ-তুং গাছ ছাড়া অন্য কোথাও নামে না। সে খায় অমৃত ফল, পান করে স্ফটিকের মত ঝরণার জল। একটা পেঁচা পচা ইঁদুর নিয়ে গাছে বসেছিল। স্বর্গীয় পাখিকে উড়ে যেতে দেখে সে তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তুমিও কি তোমার লিয়াং রাজ্য আগলিয়ে আমায় দেখে হল্লা করছ না?" (শারদ বন্যা)

মরণ সম্বন্ধে চুয়াংৎসের যা ধারণা ছিল তা নিয়ে কয়েকটি গল্প আছে। তাঁর স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন একজন বন্ধু এলেন শোকপ্রকাশ করতে। তিনি এসে দেখেন চুয়াংৎসে টেবিল বাজিয়ে গুণগুণ করে গাইছেন। বন্ধুর বকুনি খেয়ে চুয়াংৎসে বললেন :

"একজন যদি পরিশ্রান্ত হয়ে শুতে যায় আমরা হাউমাউ করে তাকে তাড়া করি না। যাকে আমি হারালাম সে অন্দর মহলের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কান্নাকাটি করে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মালে এই প্রমাণ হবে যে আমি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা কিছুই জানি না।[১০]

[৯] এইচ. এ. গাইলস্ : চুয়াংৎসে, ভূমিকা, ৭ পৃষ্ঠা।
[১০] আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ২১-২২ পৃষ্ঠা।

যখন তাঁর নিজের বিদায় নেবার পালা এল তখনও এই বিশ্বাস ভাঙেনি। মরবার সময়ে তিনি দেখলেন শিষ্যরা ঘটা করে সৎকারের আয়োজন করছে। তিনি তাদের ডেকে বললেন :

"আকাশ ও পৃথিবী আমার শবাধার; সূর্য চন্দ্র ও তারা আমার শবশয্যার সাজ। সকল জীব আমার শবযাত্রার সাথী। এতেও কি আমার মৃত্যু উৎসব সুসম্পন্ন হবে না?"

শিষ্যরা বললেন গুরুর দেহ শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে—এ কেমন করে হয়? গুরু বললেন :

"মাটির ওপরে ফেলে রাখলে শকুনিতে খাবে, মাটির নীচে পুতলে খাবে পোকা ও পিঁপড়ে। একদলকে বঞ্চিত করে আর এক দলকে খাইয়ে কি লাভ?"[১১]

এইরূপে চুয়াংৎসে তাঁর দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবন ও মরণ।

* * *

তাও-বাদ একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ নয়। এ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শনের কচকচির বিরোধিতা এর উপজীব্য। জীবনপ্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর ও বস্তুরহস্যের যুক্তিসম্মত সমাধান এতে নেই। যৌক্তিকের সঙ্গে অযৌক্তিক, লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিককে মিশিয়ে তাও-এর প্রণালী গড়া। এর বক্তব্য যে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি প্রকৃতির যুক্তি নয়। বুদ্ধি বাস্তবকে বিকৃত করে দেখে, আমি-তুমি, এটা-ওটা ইত্যাদি অবাস্তব পার্থক্য রচনা করে। প্রকৃতির সত্যকে জানা যায় অন্তর্দৃষ্টির বলে, শুদ্ধ চৈতন্যের বলে যাতে না তাকিয়ে দেখা যায়, কান না পেতে শোনা যায়, চিন্তা না করে জানা যায়।[১২] এই শুদ্ধ চৈতন্য বা 'মিং' এর প্রতীক দেবতা হন-টুন বা 'অগোছাল'।

"দক্ষিণসাগরের দেবতা হট্‌গোল আর উত্তর সাগরের দেবতা হাহুতাশ একবার মধ্যরাজ্যের দেবতা অগোছালের দেশে এসে মিললেন। অগোছাল খুব যত্ন করে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। অতিথিরা পরামর্শ করতে লাগলেন কেমন করে গৃহস্বামীর বদান্যতার প্রতিদান দেওয়া যায়। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে সকলের শরীরে দেখা, শোনা, খাওয়া ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে যে সাতটি ছেঁদা থাকে অগোছালের দেহে তার একটিও নেই। তাঁরা স্থির করলেন অগোছালের গায় এই ছেঁদাগুলো করে তাঁর কিঞ্চিৎ উপকার করবেন। প্রতিদিন একটি করে ছেঁদা করা হল, সপ্তম দিনে অগোছাল পঞ্চত্ব পেলেন।"[১৩]

যুক্তি ও আদর্শকে ভিত্তি করে যে রক্ষণশীল মতবাদ দাঁড়িয়েছিল তার পাশাপাশি চীনে ছিল ফা চিয়া নামে আর এক গোষ্ঠী। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শাংৎসে ও তৃতীয় শতকের হান ফাইৎসে ছিলেন এঁদের গুরু। এঁরা ঐতিহ্যের দান ও অলৌকিক তত্ত্ব উভয়কে বাতিল করে তার জায়গায় আইনকে বসালেন। নীতিমূল্যের ওপরে স্থান হল আইনের, আইনের ওপরে রাষ্ট্রস্বার্থের। এঁদের মতে রাষ্ট্রের কোনো নীতির বালাই থাকবে না এবং রাষ্ট্রের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে তার ক্ষমতায়। এঁরা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রজয়ের মহিমা কীর্তন করেছেন এবং এই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যশাসন পদ্ধতির বিচার করেছেন। এই দলের কঠোর বাস্তবতা ও কনফুসিয়সের নৈতিকতা উভয়ের চাপে পড়ে তাওবাদীর নিষ্ক্রিয়ার বাণী ক্ষীণ

[১১] এইচ. এ. গাইল্‌স্ : চুয়াংৎসে, ৪৩৫ পৃষ্ঠা।
[১২] উপনিষদ ও বার্গস'র সঙ্গে এই ধারণার মিল লক্ষণীয়।
[১৩] আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ৯৭ পৃষ্ঠা।

হয়ে গেল। শেষে বৌদ্ধধর্মের বন্যায় তাও-এর পথ ডুবে গেল—এর পথচারীরা আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ এক ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হল।

সতের-আঠার শতকে লক ও রুশো যে প্রকৃতি বন্দনার রেওয়াজ এনেছিলেন তাওবাদ তার পূর্বাভাস। যুক্তিবুদ্ধির ওপর রুশোর আক্রমণ এবং বর্বর জীবনের অজ্ঞানতার প্রশস্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনের অর্থহীন কৌতূহল—এসব লাওৎসে ও চুয়াংৎসের কথা মনে করিয়ে দেয়। জার্মান শূন্যবাদী ম্যাক্‌স্ স্টার্নারও সভ্যসমাজের অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলির মুখোশ এমনই নির্মমভাবে খুলে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়ার তত্ত্বকে উনিশ শতকের ইংরেজ ব্যক্তিবাদীরা 'লেসেফের' নীতির মধ্যে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু এঁদের কারও সঙ্গে তাও-পন্থীর সম্পূর্ণ মিল নেই। তাও-পন্থী লক্ ও রুশোর মত অসঙ্গতির আবর্তে তলিয়ে যায়নি। ম্যাক্‌স্ স্টার্নারের মত সে ভোগবাদে এসে পরিসমাপ্ত হয়নি। বুর্জোয়া দার্শনিকদের মত সে রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যের দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণতন্ত্রকে সমর্থন করেনি। আধুনিক কালের নৈরাজ্যবাদীদের মত সে আইন ও শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু এদের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ বলে সে মনে করেনি। সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। প্রকৃতির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারলে তবেই তার নিয়মকানুন জানা যায়। তাতেই আনন্দ, তাতেই ঊর্ন্নতি। এই সার কথাটি তাও-র সুরে—আর সব অসার বাক্‌বিতণ্ডা।

আধুনিক সাহিত্য

"সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা"-শীর্ষক কবিতা সংগ্রহখানা পেয়ে প্রথমটায় চমক লাগল। যাঁকে একদা 'বাংলার তরুণতম কবি' বলে জেনেছিলাম তিনি সত্যিই গ্রন্থাবলীর প্রবীণতায় পৌঁছে গেলেন না কি ম্যাক্‌স্‌ বীয়র্‌বম্‌ যেমন চব্বিশ বছর বয়সেই তাঁর প্রথম গ্রন্থটিকেই *Works of Max Beerbohm* আখ্যা দিয়ে প্রকাশিত করেছিলেন এও সে-ধরনের একটা হিউমার? মনে হল এই তো সেদিন মাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা "কবিতা" পত্রিকায় পড়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলাম! কিন্তু আমার চমক অবশ্যই অযৌক্তিক। কাল যথানিয়ম এগিয়ে চলছে। দেখে অবহিত হলাম যে এই কবিতা সংগ্রহে ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৭ সন অবধি রচিত কবিতার সমাবেশ, অর্থাৎ কুড়ি বৎসরের (এমন কিছু অল্প সময় নয়) সেতুবন্ধ এই কবিতাগুলিতে, কবিরও বয়স আর দ্বিতীয় দশকে নেই চতুর্থ দশকের শেষ সীমানায় প্রায় পৌঁচেছে। ১৯৩৮-এ সুভাষ যখন লেখা শুরু করেছিলেন সেই থেকে বিশ বছরের মধ্যে বাংলা কাব্য সাধনা এগিয়ে গেছে হয়তো আরো দু-পুরুষ কবিমণ্ডলে, তার tempo এখন দ্রুতধাবী আর এই দ্রুততার ঐতিহ্যে সুভাষের অংশ অসামান্য। তাঁর পাঠকের চেয়ে সুভাষের বিচারশক্তি নিপুণতর, সম্ভবত সেজন্যই চারখানি স্বকীয় কাব্যগ্রন্থ ও একখানা কাব্যানুবাদ প্রকাশের পরে লেখনীর অগ্রগতিতে ক্ষণিক যতি স্থাপনা করে তিনি তাঁর সমগ্র সাধনার পারম্পর্য ও বিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন কেন না এহেন আত্মবিচার যাবতীয় সৎ কবির পক্ষেই স্বাস্থ্যকর আত্মশুদ্ধি বিশেষ।

কোনো কোনো কবির যশঃপ্রতিষ্ঠায় কেমন একটা দুর্বার বিশ্বজিৎ আকস্মিকতা লক্ষ্য করি। বায়রন, সুইনবর্ন, নজরুল ইসলামের খ্যাতিলাভ সেই ধরনের। সমর সেনের প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সেই রকম উল্কা-ঝরা বিস্ময়, সুভাষের আবির্ভাবে তো বটেই। এ যেন রোমক সেনাপতি এলেন, দেখলেন, জয়লাভ করলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়স যার তার কবিকৃতি এমন নিপুণ, এমন স্বকীয়, এমন সার্থক যে তার তুলনা পাওয়া ভার—"পদাতিক"—পর্যায়ের কবিতাগুলি পড়ে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল আত্মরতিময় বাঙলা কবিতার মাঝখানে এই অনতি-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, সারল্যবলিষ্ঠ, রাজনৈতিক ব্যঙ্গে ও বিশ্বাসে ভরা কবিতাগুলি যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। কিন্তু অগ্নিশিখা হতে পারে উলুখড়ের আগুন, আবার চন্দন কাঠেরও হতে পারে। আকস্মিক যশঃপ্রতিষ্ঠার মূলে নিতান্তই সাময়িক সংযোজনা না সময়োত্তীর্ণ অম্লান গুণের সমারোহ সেটাই প্রশ্ন। বায়রনের প্রতিষ্ঠা বেশি দিন টেঁকেনি, সুইনবর্নেরও নয়। এঁদের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় "ফেসটাস্‌" নামক কাব্য-রচয়িতা ফিলিপ জেইম্‌স্‌ বেইলি-র জীবনে। বেইলির এ-কাব্য প্রথম যখন প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সনে তখনই বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল কিন্তু ১৮৪৩ সনে এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরবার পরে সার্বজনীন তারিফের যে-হিড়িক লাগল, যেভাবে অন্য কবিরা, সমালোচকগণ ও সাধারণ পাঠকগণ এ-কাব্যের অকুণ্ঠ স্তুতিতে নিরত হলেন তার অজস্র প্রমাণ মেলে ঐ কালের চিঠিপত্রে, ডায়েরিতে, সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে।

কিন্তু বেইলির নাম আজকাল বিস্মৃত, কেবল দু-চারজন গবেষণাকারী জানেন Spasmodic School of Poetry-র জনক ছিলেন বেইলি। শতবর্ষ পরে কালের নিকষে কোন সোনা মুছে যাবে আর থেকে যাবে কোনটি তা আমরা বলতে পারি না কিন্তু বিশ বৎসর পরে অন্তত এইটুকু যাচাই করতে পারি যে তার মূল্য বেড়েছে কি কমেছে কিম্বা স্থির হয়ে আছে। সমসাময়িক দৃষ্টিতে যে-কাব্য যত বেশি চমকপ্রদ তার দূরকালীন বিচারে ততই বেশি সতর্কতার প্রয়োজন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-আলোচনায় সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত তাঁর যশঃপ্রতিষ্ঠার চোখ-ধাঁধাঁনো আকস্মিকতাকে যেন আমরা সর্বকালীন মহত্ত্ব বলে মনে না করি যদি না সে-আকস্মিকতার মূলে সত্যিকারের মহত্ত্ব থেকে থাকে। সতর্কতার দ্বিতীয় কারণ যে তাঁর প্রথম দিককার প্রায় সব কয়টি কবিতাই নির্দ্বিধ সমকালীনতায় রঞ্জিত। সেদিনের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দূরাগত ধ্বনি আজো শুনতে পাই "পদাতিক"-এর বহু ছত্রে—

> প্রভু, যদি বল অমুক রাজার সাথে লড়াই
> কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর ধনুক।
> এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
> দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক। (৯ পৃষ্ঠা)
>
> রূপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে। (১৪ পৃষ্ঠা)
>
> মাথা ঘামাবোনা চেক-চীনা সংকটেও। (১৫ পৃষ্ঠা)
>
> মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না। (১৭ পৃষ্ঠা)
>
> বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই :
> সাঙ্গ, প্রভু, সত্যাগ্রহ? একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা? (১৮ পৃষ্ঠা)
>
> সাবাস্‌ বল্লভভাই, প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক! (১৯ পৃষ্ঠা)
>
> চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এমন
> নিবিড় নির্বাণ বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট? (২৩ পৃষ্ঠা)
>
> জীবের সুলভ মুক্তি একমাত্র স্বস্তিকার নিচে। (২৪ পৃষ্ঠা)
>
> ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভণে। (২৪ পৃষ্ঠা)
>
> হে বল্‌শেভিক, মারণ মন্ত্র মুখে তোমার। (২৬ পৃষ্ঠা)
>
> ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষে-ফুল? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার? (২৭ পৃষ্ঠা)
>
> জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই। (২৮ পৃষ্ঠা)
>
> লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স নখাগ্রে আমার
> উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যতম নেতা।
> লক্ষ্য বড়ো; ধরি তাই মহাত্মার ধামা;
> আনন্দভবনে খুঁজি মুক্তির উপায়,

প্রতিস্পর্দ্ধী, ঠাণ্ডা করে দিয়েছি কেমন?
এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না;
—ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নাই আর। (৩২ পৃষ্ঠা)

বর্গীরা আসে এদেশে বোমারু পুষ্পকে
শহুরে মোড়ল হুঁশিয়ারি হাঁকে সাইরেনে। (৩৫ পৃষ্ঠা)

নেহরুকে বিদ্রূপ-করা ছত্র কয়টির সঙ্গে তুলনীয় আরো কয়টি ছত্র "কবিতা" পত্রিকায় বেরিয়েছিল (আশ্বিন ১৩৪৭), এম. এন. রায়কে নিয়ে লেখা, জানি না কি কারণে কবিতা-সংগ্রহে তার স্থান হয়নি—

চীনের ভাগ্য শিকেয় তুলেছি। এবার
দক্ষিণা নিতে হবেই ভারত সেবার।
ইতিহাস তাহা ভুলেছি, করছি প্রচার—
ফ্যাসিবাদ বধে লেগেছো, ধর্মাবতার!
যদিচ গান্ধী বিরোধী, হে মধুসূদন,
হঠকারিতায় অভিন্ন আজ দুজন।
দলে দলে রোজ শিষ্য হচ্ছে বেহাত,
'সাধু সোভিয়েট' হাঁকতেই হয় নেহাৎ।
আগে বিপ্লব বুদ্ধির। লাল নিশান
বুথাই ওড়াই মূর্খ মজুর, কিষাণ।

সমসময় চেতন কবিমানসের যে-উত্তেজনা এ ছত্রগুলিতে নিহিত সে-চেতনা ও সে-উত্তেজনা সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আরো অনেক কবিতে পাওয়া যায় যাঁদের কেউ কেউ তার পরে আর কাব্যসাধনা করেছেন বলে আমি জানি না। আজ এসব ছত্র ও কবিতা পড়লে কুড়ি বছর আগেকার জটিল ভাবধারাগুলি মনে পড়ে। নিচের অংশ কয়টি "কবিতা"-র পুরানো সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করছি—

খবরের কাগজে কোলাহলে সহর উঠবে আর্তনাদ করে
চীনের ভীষণ বোমা
(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৪, চৈত্র, ২১ পৃষ্ঠা)

আমার দিন রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
(বিষ্ণু দে, ১৩৪৫, আষাঢ়, ১৬ পৃষ্ঠা)

বন্দী প্রমিথিয়ুস,
কত দীর্ঘ পথ
কত মরু পর্বত পার হয়ে
এসিয়ার যাত্রা
বলো, কবে সুরু হবে?
(সরোজরঞ্জন আচার্য্য, ১৩৪৫, আষাঢ়, ৩২ পৃষ্ঠা)

তারপর দু'পয়সার দেশি কাগজে
এক কাপ চায়ের আয়ুপান চলে;
চোখে ভাসে বিক্ষত চীন আর স্পেনের মূর্তি,
আর স্বস্তিকার স্বস্তিহীন অরণ্যে
নাৎসিরা হাঁটে।
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৪৫, আষাঢ়, ৪০ পৃষ্ঠা। এ-কবিতাটি আমি "পদাতিক"-এ পাইনি, কবিতা সংগ্রহেও পাইনি।)

রবিবারে
অগ্রগামী কারে,
এরোড্রোমে উড়ে উড়ে বেড়ায়
আবার দ্রুতধাবন সন্ধ্যায় সিনেমায়।
(অনুপম গুপ্ত, ১৩৪৫, আষাঢ়, ৪৪ পৃষ্ঠা)

স্পেনেও হয়তো অমনি অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি
পশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৪৫, আশ্বিন, ১৪ পৃষ্ঠা)

আকাশে উঠেছে সাঁওতালী মেঘ,
পাথুরে পেশী।
চেক-সৈন্যের মত তারা হানে ছায়া।
আমরা, যাদের ছুটি ফুরে গেছে বেশী
তারা আজ রণসজ্জার ভারে হারালো মায়া।
হেন্ লাইন্, হের্ হেন্ লাইন্ তুমি
পালাও কোথা?
(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ১৩৪৫, পৌষ, ৪৫ পৃষ্ঠা)

এর চেয়ে চলো স্পেইনে কি চায়নায়
কথা জড় কর, ভালো বক্তৃতা দাও।
(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৫, চৈত্র, ২০ পৃষ্ঠা)

কোথায় হারালো ঘুম ম্যাজিনো-র লাইনে
লাল ফানুসের শোভাযাত্রা
চীনের শহর দেখে নিষ্পলক বিভীষিকা,
বাড়ে হেথা করুণার মাত্রা।
(হরপ্রসাদ মিত্র, ১৩৪৫, আশ্বিন, ৩৭ পৃষ্ঠা)

আমি যে বেশ্যা—ক্রীতদাসী তোমার
আমি—আমি স্পেন।
(অনুপম গুপ্ত, ১৩৪৭, আষাঢ়, ২৬ পৃষ্ঠা)

ওয়ারশ-র মাঠে পপিরা ফুটেছে লাল
প্রজাপতি কাঁপে তোরণানো হেল্‌মেটে
চীনে নগরীর ইঁটের পাঁজার 'পরে
চন্দ্রমল্লী ঝরে।
(সৌরীন্দ্র মিত্র, ১৩৪৭, আষাঢ়, ১৫ পৃষ্ঠা)

ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ :
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ করো,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
(সমর সেন, ১৯৪৭, আষাঢ়, ৩১ পৃষ্ঠা)

এসব কাব্যছত্রের পেছনে সমকালীন বহু রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা বিদ্যমান। খৃষ্টীয় ত্রিশের যুগে দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যারোমিটারে পারদরেখা অতি ঘনঘন উঠাছিল নামছিল। প্রায় প্রতিদিন সংশয় সন্দেহ দ্বিধা উত্তেজনা অস্থিরতার আঘাতে মামুলি মানুষের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত, সংসার-যাত্রা বিপর্যস্ত। হিটলারের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, চীনে জাপানী হামলা, স্পেইনে কমিউনিজ্‌ম্‌ ও ফাশিজ্‌ম্‌-এর গজকুম্ভ লড়াই, চেকোস্লো-ভেকিয়ায় নাৎসি বলাৎকার, মিউনিখ, দ্বিতীয় সার্বিক যুদ্ধ—বহির্জগতের কয়েকটি মাত্র মোটা ঘটনা এই কয়টি। দেশের মধ্যে (বিশেষত বাঙলা দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে) উত্তেজক ঘটনা ঘটেছে দ্রুতচালিত চলচ্চিত্রের মতো : চাটগাঁর রোমাঞ্চকর বিপ্লবপ্রয়াস ও অন্যত্র সন্ত্রাসবাদীদের অকুতোভয় কার্যাবলী; গান্ধীজীর দণ্ডিযাত্রা ও অচিরেই দাবানলের মতো চারিদিকে কংগ্রেসী আন্দোলনের অনিবার্য প্রসার; গোলটেবিল বৈঠক; দেশব্যাপী মন্দা-র বাজার; কংগ্রেসী আন্দোলনের ক্রমক্ষীয়মাণ উদ্যম; গান্ধীর একনেতৃত্ব-বিরোধী সুভাষবসুর উত্থানে কংগ্রেসে চিড়; নানারকম 'বামপন্থী' দল ও উপদলের উদ্ভব; নূতন শাসনতন্ত্রে প্রথম সাধারণ নির্বাচন; অন্যত্র কংগ্রেসী শাসন ও বাঙলায় অব্যবস্থা; ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধ; দ্বিতীয় যুদ্ধ; সুভাষ বসুর অন্তর্ধান; যুদ্ধের আতঙ্ক, চাটগাঁয়, কলকাতায় ও অন্যত্র হাওয়াই হামলা; কলকাতা থেকে লক্ষ লক্ষ ত্রাসগ্রস্ত নরনারীর পলায়ন; আগস্ট বিদ্রোহ, বাঙলায় দুর্ভিক্ষ। তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল বাঙালী সমাজ। এই তালিকায় নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা অভিপ্রায় আমার নেই, শুধু এই অভিপ্রায় যে পুরানো লোকেদের স্মৃতিতে যেন সে-দিনের আবহাওয়ার আমেজ উদ্দীপিত হয় আর আজকের যেসব পাঠক সেদিনে জন্মাননি অথবা সদ্য জন্মেছেন তাঁদের কল্পনায় যেন ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে সে-আবহাওয়ার দোলা লাগে। অসংখ্য বেদনারসে বিষায়িত ঐ দিনগুলির কতটুকু আভাস আমরা সমকালীন বাংলা কাব্যে পাই? সুদ্ধ "কবিতা" পত্রিকার প্রথম দু-বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখুন না। তাতে পাবেন রবীন্দ্রনাথের ও সেদিনের উৎকৃষ্ট কবিদের রচনা, বুদ্ধদেব জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তী

প্রেমেন্দ্র মিত্র অজিত দত্ত হেম বাগচী প্রমুখ শক্তিশালী রবীন্দ্রোত্তর কবিদের রচনা। "কবিতা"র গোড়ার সংখ্যাগুলিতে যেসব কবিতা পড়ি তাতে উল্লেখ নেই বহির্জাগতিক বা আভ্যন্তরীণ কোনো রাজনৈতিক অবস্থার। ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ সনে যে পৃথিবীর লোক সার্বিক বিপর্যয়ের দিকে চলছিল দুর্বার নায়াগ্রাপ্রপাতের বেগে, সেদিনের বাংলা কাব্যে কতটুকু পাই তার স্পষ্ট উল্লেখ বা আভাস? হয়তো কদাচিৎ পাওয়া যাবে (যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' কবিতায়) অগভীর আইডিয়ালিস্টিক সংবেদনার রচনাবিলাস। হয়তো কোথাও কোথাও (যেমন সমর সেনের কবিতায়, ক্রমে বিষ্ণু দে'র ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়) আত্মরতির জটিল লুতাতন্তুতে ছিটকে জড়িয়েছে দু-চারটি অতিবিরল সমকালীন সমাজ-চেতনা, তার কখনো বেদনাবিদ্ধ কখনো ব্যঙ্গশাণিত কথনরীতিতে প্রমাণ মিলবে যে কবির ব্যক্তিত্বে ও সামাজিক পরিবেশে জন্মেছে প্রচণ্ড গরমিল।

আমি আদৌ একথা বলছি না যে কাব্যে সমকালীন রাজনীতি প্রবেশ করাতেই হবে। পৃথিবীতে প্রচুর সংকাব্য বর্তমান যাতে সমকালীন রাজনীতি একেবারেই গরহাজির। মিলটনের "প্যারাডাইস লস্‌ট্‌"-এ যদি বা পাওয়া যায়, মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্যে" সমকালীন রাজনীতি খুঁজে পাওয়া খুব ধুরন্ধরেরও কর্ম বলে মনে হয় না। ব্লেকের কবিতায় আছে, কিন্তু "এন্‌শেণ্ট্‌ ম্যারিনার" ও "হাইপেরিয়ন"-এ সমকালীন রাজনীতি আছে বলে তো আজ অবধি শুনিনি। আর "রঘুবংশম্‌" যদিও বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতীকাচিত্র হয়ে থাকে, "মেঘদূতম্‌" রাজনীতির নিকটেও ঘেঁষেনি। বাংলা সাহিত্যের যে-কালের কথা এখানে আলোচনা করছি সে-কালে জীবনানন্দর কাব্যেও পাই রাজনীতিবর্জিত সং ও সুন্দর কাব্য। রাজনীতির সঙ্গে কাব্যের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, "কবিতা"র প্রথম পর্যায়ে তা ছিল না বলে আমার নিজের তো অস্বস্তি নেই। আমি শুধু এই তথ্যটি পেশ করতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বসূরীরা রাজনৈতিক কাব্যরচনায় স্বতঃপ্রণোদিত হননি। আঠারো বছরের তরুণের লেখা বিদ্যুৎপ্রভ কবিতাগুলি এসব পূর্বসূরীদের কাছে ও অগণিত নতুন-লিখিয়েদের কাছে নিয়ে এলো নূতন বিষয়বস্তুর উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কবিদের পক্ষে যে-সমাজচেতনা ছিল পরোক্ষবোধ মাত্র, আকাডেমিক উপলব্ধি মাত্র, সে-সমাজচেতনা সমকালীন রাজনীতিতে বহিরাশ্রয়ী সংশ্লেষণ আবিষ্কার করল সুভাষের কাব্য পাঠান্তে। অনেক ভোঁতা পদ্য লেখা হল এই হিড়িকে, কিন্তু সন্দেহ নেই যে প্রায় বছর দশেকের মতো বাঙলা কাব্য বিষয়প্রধান হয়ে উঠল, আর সে-বিষয় স্পষ্টই রাজনীতি-সম্ভূত। বুদ্ধদেব বসু সহসা 'গণমনের আন্দোলন' সম্বন্ধে সচেতন হলেন, তাঁর কাব্যে প্রবেশ করল য়ুটোপীয় সোশ্যালিজ্‌মের অভ্যস্ত বাক্‌প্রতিমা (ইমেজ্‌) : আশার লাল মশাল, তরুণতার আগুন, আশার রংমশাল ইত্যাদি। প্রৌঢ় বা প্রায়-প্রৌঢ় অন্যান্য বাঙালী কবিরা এই নূতন বিষয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হলেন, কিছুদিনের জন্য বাঙলা কাব্যে চল্‌ল নতুন রাস্তা। এ-কাব্যের পথিকৃৎ তদানীন্তন তরুণতম কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এটি আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি ঐতিহাসিক তথ্য।

২

কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে সমসাময়িক রাজনীতির প্রয়োগ সাহিত্যের ইতিহাসে পুরানো কথা। গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত সাহিত্যে রাজনীতির উল্লেখ অবিরল। ইংরেজি সাহিত্যের

পুরানো যুগে লক্ষ্য করি চসার বা গাওয়র রাজনীতি-ঘেঁষা না হলেও ল্যাংল্যাণ্ড অবশ্যই তেমন ছিলেন। শেক্সপীয়র সমসময় নিয়ে প্রত্যক্ষরূপে কোনো নাটক লেখেননি বটে কিন্তু তাঁর রচনায় অসংখ্য পরোক্ষ উল্লেখ অগণিত পি-এইচ-ডি প্রার্থীর আহ্যাদের কারণ। ষোল এবং সতেরো শতকের ইংরেজি সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বহুব্যাপ্ত। ড্রাইডেন ও তৎপরবর্তী কবিদের রচনায় কল্পজগৎ ও জড়জগৎ অবিভিন্ন। রাজনীতিপ্রবণ কাব্য (political verse) উনিশ শতকের কাব্যেও স্থান পেয়েছে, তবু আমার বিচারে ১৯৩৫-৩৬ সন থেকে বাঙলায় রাজনীতিপ্রবণ কাব্য যে-রূপ নিয়েছে তার সঙ্গত তুলনা মেলে ইংরেজি ভিক্টরীয় কাব্যের সঙ্গে, প্রাক-ভিক্টরীয় কাব্যের সঙ্গে নয়। ভিক্টরীয় যুগের পূর্বে (ব্লেইক ও শেলি ছাড়া অন্য কবিদের রচনায়) রাজনীতি কেবল ব্যক্তিগত উষ্মা, ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিদ্বেষের জনক, বিশেষ কোনো ঘটনা বা রাজনীতিপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি শ্লেষ প্রয়োগেই কবির কল্পনাশক্তি নিযুক্ত ও নিঃশেষিত, তাঁর কল্পনাশক্তি কোনো বৃহত্তর সার্বিক আদর্শের অভিসারী নয়। ড্রাইডেনের "অ্যাবসালম্ অ্যাণ্ড অ্যাকিটফেল্" অথবা চার্লস চার্চিলের ব্যঙ্গ-কাব্যগুলি নিতান্তই নিরাদর্শ। ব্লেইক, ওয়র্ডসওয়র্থ, বায়রণ ও শেলির কাব্যে দেখতে পাই ব্যক্তিবিশেষে বা ঘটনাবিশেষে কবির দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির ও ঘটনার ওপারে উদার জীবন-দর্শনের নাভিকেন্দ্রে পৌঁছবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কিন্তু কী এঁদের লেখায়, কী ল্যাংল্যাণ্ডের রচনায়, রাজনীতিবোধ ততটা জড়জগৎ-নির্ভর হয়নি যতটা হয়েছে স্লেটোপন্থী আইডিয়লিজমে অনুরাগী, নির্বস্তুক ভাবাদর্শের চিরন্তনতায় প্রত্যয়ী।

কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে রাজনীতি ব্যাপকতা লাভ করে ভিক্টরীয় যুগে। আমি যখন একদা ইংরেজি কাব্যের এই অবজ্ঞাত দিকটি সমনোযোগে অধ্যয়ন করেছিলাম তখন দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে এমন কোনো বিশিষ্ট ভিক্টরীয় কবি নেই যিনি অন্তত অল্পবিস্তর রাজনৈতিক কাব্য লেখেননি, আর রাজনীতি-সচেতন স্বল্প-খ্যাতিমান কবি ছিলেন অন্তত শতাধিক। এই কাব্য অধ্যয়ন করার সময় আমার বারবার মনে পড়েছে বাংলার সাম্প্রতিক পোলিটিক্যাল কবিতার কথা, কেননা এই দুই ভিন্নভাষী ভিন্নযুগীয় কাব্যের সংযোগ তাদের আন্দোলন-নির্ভরতায়। ল্যাংল্যাণ্ড বা ড্রাইডেন বা শেলির কাব্যে রাজনীতির নৈতিক অংশ পাওয়া যায় অথবা ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে যেমন আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তখন সে-আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয় অন্যরকম কবিতা। তাতে জড়জগতিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক প্রত্যয়—political faith—দুই সমভাবে জড়ানো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মার্ক্সবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছে বলে আমি জানি। তাঁর কবিতায় পাই মার্ক্সবাদের নির্যাসরূপী কয়েকটি প্রবল অনুভূতি আর মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক অনেক ঘটনার উল্লেখ। ইংরেজ কবি আর্ণেস্ট জোন্স্ ছিলেন Chartist, বিপ্লবী কবি। তাঁর কাব্যের অনুভূতিগুলি উদ্ভূত হয়েছে তাঁর বিপ্লববাদ থেকে, আর সেই বিপ্লববাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আলোচনা করেছেন সমসাময়িক ঘটনাবলীর (যথা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ)। ভিক্টরীয় ও আধুনিক বাংলা রাজনৈতিক কাব্যের জ্ঞাতিত্ব এখানেই—রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা আর সে-প্রত্যয়ের প্রচ্ছায়ে সমসাময়িক ইতিহাসের মূল্যায়ন। ঐতিহাসিক অবস্থার বিচারেও ভিক্টরীয় ইংল্যাণ্ডে ও ত্রিশ-যুগীয় বাংলা দেশে তুলনা মেলে। সেদিনের ইংল্যাণ্ডে অবশ্য সার্বিক সমরনীতি ছিল না কিন্তু যে—অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বঙ্গীয় জীবনে অশেষ পীড়া

এনেছে, শতাধিক বৎসর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে তা কতটা গ্লানির সৃষ্টি করেছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় মিসেস্ গ্যাসকেলের "মেরী বার্টন্" নামক উপন্যাসে—

> Whole families went through a gradual starvation. They only wanted a Dante to record their sufferings. And yet even his words would fall short of the awful truth; they would only present an outline of the tremendous facts of the destitution that surrounded thousands upon thousands in the terrible years 1839, 1840 and 1841. . . . The most deplorable and enduring evil that arose out of the period of commercial depression to which I refer, was the feeling of alination between the different classes of society.
>
> (Mrs. Gaskell—*Mary Barton*, ch. vii)

মহাকাব্যের উপযোগী এই মর্মন্তুদ ক্লেশের কাহিনী শিল্পায়িত হয়নি কোনো দান্তের রচনায় কিন্তু ক্ষুদ্রতর যে সব কবি এই সমাজ পরিবেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের কৃতিত্ব নেহাৎ নগণ্য নয়। এবেনেজার এলিয়ট নামক জনৈক কবি লিখছেন—

> Haste! havoc's torch begins to glow,
> The ending is begun;
> Make haste; destruction thinks ye slow;
> Make haste to be undone!
> Why ye are call'd 'My lord', and 'Squire',
> While fed by mine and me,
> And wringing food, and clothes and fire
> From bread-tax'd misery?
>
> (Ebenezer Elliott—*Corn Law Rhymes*)

তুলনা করুন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—

> ঐ আসে! ঐ আসে!
> অরক্ষিত রথচক্র,
> স্খলিত বজ্রের নিচে
> বিনা মেঘে দিগভ্রান্ত দেশগর্ব কাঁপে।
> হত্যাকারী হাসে,
> অস্থির আঙুলে দিন গুণে চলে,
> পথের দুরন্ত হাড়কাঠি দিয়ে মাপে। (৭০ পৃষ্ঠা)

অবেনজার এলিয়টের আরেকটি কবিতার অংশ—

> Day, like our souls, is fiercely dark;
> What then? 'tis day!
> We sleep no more; the cock crows—hark!
> To arms! away!
> They come! they come! the knell is rung

Of us *or* them.
Wide o'er their march the pomp is flung
Of gold and gem.

(*Corn Law Rhymes*)

তুলনা করুন সুভাষের কবিতা—

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—
কালো রাত্রির বুক চিরে,
চলো
দুহাতে উপড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙীন সকাল।

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—
পঙ্গপালকে তাড়িয়ে, মাঠের
আমরাই হবো সম্রাট।
দিগদিগন্ত পাকা ফসলের
সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো। (১৬৯ পৃষ্ঠা)

তুলনার মানে নয় যে উদ্ধৃতাংশগুলি জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো মিলে যাচ্ছে। যাবেই বা কেন? দুজন স্বতন্ত্র কবির স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তুলনার মানে এই ইঙ্গিত করা যে তুল্য জড়জাগতিক পরিবেশে তুল্য রাজনৈতিক আন্দোলন জাগে আর সে-আন্দোলন থেকে যে কাব্য প্রেরণা পায় সে-কাব্যের অন্তরাবেগ, তার ইমেজ বা রূপকল্প, এমন কি তার সুরেও জ্ঞাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আরো দুটি অংশ পাশাপাশি দেখা যাক, তাদের মূল প্রত্যয় বিদ্রোহী জনতার সংহত শক্তিতে, একই উৎকণ্ঠ সুর দুই অংশে—

Slaves, toil no more!—Why delve, and moil, and pine,
To glut the tyrant—forgers of your chain?
Slaves, toil no more! up, from the midnight mine,
Summon your swarthy thousands to the plain:—
Beneath the bright sun marshalled, swell the strain
of Liberty:—and while the lordlings view
Your banded hosts, with stricken heart and brain,—
Shout as one man,—'Toil we no more renew,
'Until the Many cease their slavery for the Few!'

(Thomas Cooper—*The Purgatory of Suicides*).

রুখবে কে আজ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি।
জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি।

একা নই, আছে সঙ্গে পাথুরে পেশী হাজার
হাতে হাত বাঁধা, চড়া গলা, পায়ে জোর কদম,
দু চোখে সূর্য ক্রমেই প্রখর; ভেঙেছে ভ্রম—
শত্রুর টুঁটি ছিঁড়বে এবার নখের ধার।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৭২ পৃষ্ঠা)

আরো দুটি কবিতা আমার পাশাপাশি পড়তে ভালো লাগে। তাদের সুর একরকম নয়—একটিতে শ্লেষ আরেকটিতে ক্রোধ—কিন্তু দুটি কবিতায় একই তীব্র শোষক বিদ্বেষ, আর যে-বিদ্বেষের একটি কারণ শোষকের পাশবিক রিরংসা।

The earth, the earth is ours!
Its corn, its fruits, its wine,
Its sun, its rain, its flowers,
Ours, all, all!—cannot shine
One sunlight ray, but where
Our mighty titles hold;
Wherever life is, there
Possess the Kings of Gold.

*

The father writhes a smile,
As we seize his red-lipped girl,
His white-loined wife; aye, while
Fierce millions burn, to hurl
Rocks on our regal brows,
Knives in our hearts hold—
They pale, prepare them bows
At the step of the Kings of Gold.

(Ebenezer Jones—*Song of the Kings of Gold*)

কুঠিয়াল এক সাহেবের লাশে
শকুনিতে খায় ছিঁড়ে
লুণ্ঠনকারী পঁচিশটা যুগ
সাম্রাজ্যের নেশাতুর চোখ থেকে।
সে দৃশ্য দেখে—
দেশটাকে ভালোবেসে
বাপদাদা যার প্রাণ দিল ফাঁসিকাঠে।
সে দৃশ্য দেখে—
শাদা ছেলে পেটে ধরে
যার কচি মেয়ে দিয়েছে গলায় দড়ি।
সে দৃশ্য দেখে—
যার বংশের বাতি

নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে।
দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায়
সুলতান, রাজারাজড়া, উজির, শিখণ্ডীদের মাথা। (৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা)

ম্যাথিউ আর্ণল্ডের বন্ধু ক্লাফ-এর কবিতার সঙ্গে বাঙালী কবিতা মেলে—

Each for himself is still the rule:
We learn it when we go to school—
The devil take the hindmost, O!
(A. H. Clough—*In the Great Metropolis*)

দৈবপ্রসাদে কবে সংসার
কচি জনতায় গিয়েছে ভরে—
সকলে পারি না বাঁচতে, কাজেই
আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া। (৬ পৃষ্ঠা)

তুলনীয় কাব্যাংশ আরো অনেক পাওয়া যায় কিন্তু তুলনাসংগ্রহ আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারলে সন্তুষ্ট যে রাজনৈতিক প্রত্যয়-মথিত যে-আবেগ আজ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কোনো কোনো বাঙালী কবির রচনায় প্রকট হয়েছে সে রকম আবেগ শতাধিক বৎসর পূর্বে—যখন কার্ল মার্ক্স্ লণ্ডনের রাজপথে চার্টিস্টদের বিশাল মিছিলের আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন—ইংরেজ কবিদের রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল। কবিরা দূর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বা ঘটনাবলী লক্ষ্য করেছেন, রাজনীতির কর্মকাণ্ডে বড়ো বড়ো দার্শনিক নীতির বা ভাবসিঞ্চিত ধারণার সমর্থন পেয়েছেন কিন্তু কবিরা স্বয়ং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবেন, সে-আন্দোলনের প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হবে, এমন ব্যাপার ভিক্টরীয় যুগের পূর্বে বড়ো একটা হয়নি। ভিক্টরীয় কবিরা বুঝেছিলেন যে তাঁরা নতুন ধরনের বিষয়প্রধান কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত, সমসাময়িক সমালোচকরাও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন কাব্যে রাজনীতির আমদানি সঙ্গত কিনা। এবেনেজার এলিয়টের কাব্যাংশ পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তিনি একদা এবিষয়ে বলেছিলেন—

> There is nothing unnatural or improper in the union of poetry and politics. . . . Any subject whatever in which man takes interest, however, humble and commonplace it may be, is capable of inspiring high and true poetry.
>
> [কাব্য ও রাজনীতির মিলনে অস্বাভাবিক বা অবৈধ কিছুই নেই...যে-বিষয় মাত্রেই মানুষ আদীপিত হয়, তা সে যতই মামুলি ও আনত হোক না কেন, তা থেকে সৎ ও মহৎ কাব্যের প্রেরণা মিলতে পারে।]

অপর পক্ষে জেরাল্ড ম্যাস নামক জনৈক কবি (ইনি প্রথমে বিপ্লবী ছিলেন, পরে নানারকম ধোঁয়াটে মতবাদ অবলম্বন করে সাহিত্য সমাজে রেসপেক্টেবল হয়ে ওঠেন) বলেছেন—

> I am convinced that a poet must sacrifice much if he writes party-political poetry. His politics must be above the pinnacle of party zeal ; the politics of eternal truth, right and justice.
>
> [আমি নিশ্চিত জানি যে যে-কবি দলীয় রাজনীতিসংক্রান্ত কবিতা লিখতে যাবেন তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাঁর রাজনীতি দলীয় উদ্দীপনার শিখরের

> চেয়েও উঁচুতে থাকবে, এই হওয়া উচিত, তাঁর রাজনীতি হবে শাশ্বত সত্য শিব ও ন্যায়ের রাজনীতি।]

এমন ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ভিক্টরীয় যুগের এক প্রভাবশালী সাহিত্য-পত্রিকায়, ফাঁপা কথার বুনোনিতে—

> The only politics for *poetry* are the politics of human nature and the whole universe—not those modifications of law and government which are expounded by acts of Parliament . . . poetry may declaim and take a side, but like a beautiful woman in battle, she is not in her sphere. . . . The politics for poetry must be those that appeal to the heart universal.
>
> (*The Athenaeum*, 1831, pp. 577-78)
>
> [কাব্যে কেবল যে-রাজনীতির অনুমোদন করা যায় যা মানবচরিত্রের ও সমস্ত জগতের রাজনীতি—আইনের ও সরকারের যে সব পরিবর্তন পার্লামেণ্টের নির্দেশ-অনুযায়ী সে সব পরিবর্তন নিয়ে এ-রাজনীতি সংশ্লিষ্ট নয়...কাব্য কখনো কখনো এক পক্ষে যোগ দিয়ে চড়া গলায় কথা বলতে পারেন কিন্তু রণক্ষেত্র-বিহারিণী সুন্দরী নারীর মতোই তিনি স্বস্থানভ্রষ্ট...কাব্যের রাজনীতি তাই যা শাশ্বত চিত্তে আবেদন জাগায়।]

এ সমস্ত ধারণার সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী বাণী গ্যোয়টেতে পাওয়া যায়—

> If a poet would work politically, he must give himself upto a party, and so soon as he does that, he is lost as a poet—he must bid farewell to his free spirit, his unbiased view, and draw over his ears the cap of bigotry and blind hatred. The poet, as a man and citizen, will love his native land, but the native land of his *poetic* powers and poetic action is the good, noble and beautiful, which is confined to no particular province or country. . . . . Remember the politician will devour the poet. His song will cease.
>
> (*Conversations with Eckermann*)
>
> [যে-কবি রাজনৈতিক কর্মে নিযুক্ত হবেন তাঁকে বিশেষ কোনো দলভুক্ত হতে হবে এবং দলভুক্ত হলেই কবি হিসেবে তাঁর মৃত্যু হল, বিচ্ছেদ ঘটল তাঁর মুক্ত অন্তরাত্মার সঙ্গে, অপক্ষপাতী দৃষ্টির সঙ্গে। গোঁড়ামির অন্ধ হিংসার টুঁপিতে তিনি কান অবধি ঢাকা পড়লেন। কবি যেখানে মানুষ, নাগরিক, সেখানে স্বদেশপ্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু যেখানেই কোনো শুভ, মহৎ, সুন্দর, সেখানেই তাঁর কবিত্বের ও কবিতার স্বদেশ, তা কোনো বিশেষ দেশে বা প্রদেশে আবদ্ধ নয়...মনে রেখো, রাজনীতিজ্ঞ কবিকে গ্রাস করবে। তাঁর গান থেমে যাবে।]

এ সব উক্তির সঙ্গে তুলনীয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কথা। "পদাতিক" প্রকাশিত হবার অনতিকাল পরে "কবিতা"র ১৩৪৭ চৈত্র সংখ্যায় সুভাষ একটি সংক্ষিপ্ত রিভিউ লেখেন সত্যশক্তি ঘোষাল ও ফল্গু কর নামক দুজন নবীন কবির গ্রন্থ প্রসঙ্গে। রিভিউটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল কেননা এ-লেখাটিতে সুভাষের তাৎকালিক

রাজনৈতিক ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তা ছাড়া আরো দুয়েকটি কথা আছে যা পোলিটিক্যাল কাব্য সম্বন্ধে তাঁর নিষ্কম্প প্রত্যয় বলেই আমার মনে হয়—

> পৃথিবীর চেহারা দ্রুত বদলাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আজ বিভক্ত, প্রশ্নচিহ্নিত পৃথিবী কেবল দার্শনিক জিজ্ঞাসাতেই সম্পূর্ণ নয়, আমাদের জীবনের একেবারে গোড়ায় সে তার নিষ্ঠুর লেলিহ হাত বাড়িয়েছে। আমরা এতদিন বুঝেছিলাম বৈরাগ্যই জীবনে একমাত্র ব্রত। তাই গোলাঘর খালি করে কৌপীন সম্বল করেছিলাম, ভিক্ষায় যদি বা কিছু জুটতো আবগারিতে গুরুদক্ষিণা গুণতাম। ইতিমধ্যে কী এক দুরূহ কারণে যুদ্ধ বাধলো। এতদিন অহিংসাকে সার জেনেছিলাম। এবার দেখলাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে উদ্যত সঙ্গীনের বিজ্ঞাপন। এদিকে দেশলাইয়ের দর চড়লো।
>
> আজ যাঁরা সমাজের এই সঙ্কট অবস্থা দেখে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং একে স্বরূপে দেখে এ থেকে উদ্ধারের পথ বলছেন, তাঁদের স্বভাবতই আমরা শ্রদ্ধা জানাবো।
>
> * * *
>
> [সত্যশক্তি ঘোষাল সম্বন্ধে] তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস কার্যে কোথাও দৃষ্টিকটু হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি কাব্যাংশের কোথাও সংবাদপত্রের সাহায্য না নিয়েও যেভাবে সমাজবোধের পরিবেশন করেছেন, তাতে করে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হয়। তাঁর কবিদৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের বৈরাগ্যে শেষ হয়নি, সেখানে **বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মেচ্ছার সহযোগ ঘটেছে।**
>
> * * *
>
> [ফল্গু কর সম্বন্ধে] তাঁর কাব্য তাঁর বিশ্বাসের অভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় তিনি এখনও সংশয়িত। আমার ব্যক্তিগত মত, **সংশয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যে-কোনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলে** তাঁর কবিতা আরও খুলবে।
>
> (বোল্ড লাইন আমার)

এতসব উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণ হয় যে রাজনীতি ও কাব্যের (তথা শিল্পের) সম্পর্ক সম্বন্ধে বিচিত্র ও বিরোধী মতামত বিদ্যমান। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন নিঃসঙ্কোচে পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন ও লিখছেন যে তাঁর কাব্যের আলোচনায় এ-সংক্রান্ত মূল তত্ত্বটিরও আলোচনা হওয়া দরকার, আর এই তত্ত্বটি সুপ্রকট করার আংশিক উদ্দেশ্যেই আমি উপরে ভিক্টরীয় কাব্যের উল্লেখ করেছি।

৩

কাব্যে রাজনীতির স্থান কতটুকু আসলে এ-সমস্যা কাব্য বিষয় প্রধান কিনা সে-সমস্যার সঙ্গে জড়িত। সাহিত্যিক আলোচনায় কতকগুলি প্রশ্ন নেহাৎই কুতর্ক, কুটতর্ক তো বটেই। কাব্য বিষয়-প্রধান না ছাঁদ-প্রধান? যদি বিষয়-প্রধানই হয় (সব কাব্য না হোক, অন্তত কিছু কাব্যও যদি হয়) তা হলে যে কোনো বিষয়ই কাব্যে গ্রাহ্য, না কোনো কোনো বিশেষ বিষয় কাব্যে অপাংক্তেয় যেমন কিনা রবীন্দ্রনাথ বেগুনকে কাব্যসম্মত মনে করেননি কেননা (তাঁর ধারণায়) উক্ত উদ্ভিজ্জ বস্তুটির উল্লেখে পাঠকচিত্তে যে-পরিমাণে রন্ধনশালার ভাবানুষঙ্গ

উদ্রিক্ত হয়, সুকুমার কলার আকৃতি সে-পরিমাণে হয় না। কাব্যে যদি বিষয়ের বাছাই করতে হয় তাহলে রাজনীতি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা অথবা ইংরেজি সমালোচনাশাস্ত্রে যে তিনটি অনিশ্চিত অভিধাসম্পন্ন কথা নিয়ত প্রযুক্ত—Nature, Man, Love প্রকৃতি, মানুষ, প্রেম—সুদ্ধ সে-তিনটি বিষয় কাব্যের ক্ষেত্র জুড়ে থাকবে কিনা এও একটি সমস্যা। প্রকৃতি, মানুষ ও প্রেমের চেয়ে বিষয় হিসাবে রাজনীতি নিকৃষ্ট কিনা, নিকৃষ্ট হলে কতটা নিকৃষ্ট? উপরে উদ্ধৃত গ্যোয়টের উক্তিতে ও অন্য উক্তিতে এসব সমস্যা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

এসব সমস্যা কু-সমস্যা, এসব মত গোলকধাঁধার পথপ্রদর্শক। এসব আলোচনা কুতর্ক এই কারণে যে সার্থক ও পূর্ণ রসসৃষ্টিতে বিষয় ও রূপ ('ফর্ম') প্রভিন্ন থাকে না, বিষয় ও রূপ পরস্পরে অন্তর্নিহিত হয়ে পড়ে। যে-রচনায় বিষয় ও রূপের প্রভেদ প্রকট, সে-রচনা শিল্পের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি, খানিকদূর এগিয়েছে হয়তো। সৃষ্টির অনির্বচনীয় মুহূর্তের পূর্বক্ষণ অবধি কবির প্রস্তুতিশীল চিত্তে বিষয় ও রূপ আলাদা থাকতে পারে, তিনি তখন বলতে পারেন আমি অমুক বিষয় নিয়ে লিখব আর অমুক কাব্যরূপ অবলম্বন করব। কিন্তু বিষয় ও কাব্য সার্থক নয়, রূপ ('ফর্ম') ও কাব্যও সমার্থক নয়, কাব্য বস্তুত বিষয়ের ও রূপের অতীত একটি তৃতীয় সত্তা। ব্রাউনিংয়ের অ্যাব্‌ট্‌ ভোগ্‌লার বড়ো খাঁটি কথা বলেছিলেন that out of three sounds he (the musician) frame not a fourth sound, but a star; বস্তুত যিনি বুঝতে পারেননি শিল্পায়িত অভিজ্ঞা ও সে-অভিজ্ঞার উপাদানে প্রভেদ কতটা সৌল প্রকৃতিগত, তিনি কাব্যের তথা শিল্পের স্বরূপ বুঝতে পারেননি। কাব্যে পরিণত হবার পূর্বে বিষয় সংক্রান্ত experience বা অনুভূতি এবং ফর্ম সংক্রান্ত experience বা অনুভূতি এক মহত্তর গভীরতর শক্তির (যাকে ইম্যাজিনেশ্‌ন্‌, সৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে) অরোধ্য জারকরসে সিঞ্চিত চূর্ণিত মথিত হয়ে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় সত্তায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যাকেই আমরা বলি কবিতা, তা শুদ্ধ বিষয় নয় ফর্মও নয়। সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে-বস্তুটি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় (যেমন প্রেম বা রাজনীতি বা নিসর্গপ্রীতি) অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফর্ম (যেমন সনেট, গান বা মহাকাব্য, অথবা পয়ার ত্রিপদী বা ছড়ার ছন্দ), সৃষ্টির পরে তা হয়ে গেল কাব্য, আর তাকে ফর্ম বলতে পারি না বিষয়ও বলতে পারি না। যা ছিল প্রেম বা রাজনীতি, যে-প্রেম বা যে-রাজনীতি রামা শ্যামা যে কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসাধ্য ও অনুভূতিসাধ্য, কবির কল্পনারসে সিঞ্চিত হয়ে, সৃষ্টিকর্মে জারিত হয়ে তা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির অতীতে এতই দূরে চলে গেল যে তাকে আর প্রেম বা রাজনীতি বলা চলে না, শিল্পায়িত কাব্যীভূত প্রেম বা রাজনীতি বললে বরং কিছুটা যথার্থ হয়। প্রাক-কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলোটিতে।

কবিতা-পাঠকের কারবার (সমালোচকেরও, কেননা সমালোচক তো পাঠকই, বিচারশক্তি-সম্পন্ন পাঠক) আসলে সৃজনোত্তর রসবস্তু নিয়ে, তাঁর নিঃসংশয় চরম প্রশ্ন : সৃষ্টবস্তুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা, কবির প্রাক্‌সৃজন অনুভূতি শেষ অবধি শিল্পায়িত হয়েছে কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে তা হলে কাব্যোক্ত প্রেম বা রাজনীতি সাধারণ প্রেম বা রাজনীতি-ই থেকে গেল। আর যদি শিল্পায়িত হয়ে থাকে তাহলে প্রেম আর সাধারণ প্রেম ভাবনা নেই, হয়েছে এক অসাধারণ রসবস্তু।

আমার কাব্য-অভিজ্ঞতায় ও যুক্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যে কোনো

বিষয়বস্তু কাব্যশিল্পে গ্রাহ্য যদি সেই বিষয়বস্তুর আদিম ভাবনা শেষ পর্যন্ত কবিচিত্তকে সার্থক সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। রাজনীতিতে কাব্যের সমুচিত বিষয়বস্তু মিলতে পারে কিনা এই নিয়ে ভিক্টরীয় সাহিত্যে যে-সমস্যা উঠেছিল (হালের বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও সে-সমস্যা উঠেছে বলে জানি) সে-সমস্যা আমার বিবেচনায় অবান্তর। সুভাষ নিজে 'কবিতার বোঝাপড়া'-শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—

> 'মানুষ' বলতেই একটা বিশেষ মানুষ আমার মনের মাঝখানে ভেসে ওঠে...যখন কবিতা লেখা হয়, নিরাকার নির্গুণ মানুষে কাজ হয় না। কবিতার জন্যে চাই গুণধর মানুষ। সে মানুষ এমন হবে যাকে ধরা-ছোঁয়া যাবে...আমি যেমন পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তেমনি অন্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষভাবেই দেখাতে চাই। কবিতার জগতে সব কিছুরই হয় গড়ন নয় স্বাদ, হয় রং নয় গন্ধ, আছে—সব কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় বলেই পৃথিবী শুধু পৃথিবী নয়, পৃথিবী ধরণী।...জীবনের ডালে কবি নাড়া বাঁধে।
>
> (চতুরঙ্গ, মাঘ ১৩৬৩, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

কথাটি সত্য। যে-পদ্যলিখিয়ে বলেন 'কল্পনা আমার প্রজা; মগজের আমি জমিদার/সেখানে বিশ্বের কোন ঘটনার মানি না প্রভাব', তাঁর মনঃশক্তি তাঁর পদ্যরচনা-শক্তির চেয়ে দুর্বল। বিশ্বের ঘটনা ছাড়া কবিতা হয় না, কোনো শিল্পই হয় না, বস্তুত কোনো মানবিক কর্মই হয় না। কবিতা নিজেই বিশ্বের ঘটনা। যেহেতু রাজনীতি বিশ্বেরই ঘটনা, নাঁহারিকা-মণ্ডলের নয়, আর যেহেতু রাজনীতি (গ্রাম্য, প্রাদেশিক, আন্তর্জাতিক যেমন রাজনীতি-ই হোক না কেন) এমন ঘটনা যাতে চিরকালই অসংখ্য মানুষ প্রচুর উদ্দীপনা পেয়েছে, সে জন্য রাজনীতি কাব্যে অবশ্য গ্রাহ্য, ততটাই গ্রাহ্য যতটা প্রেম বা প্রকৃতি বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু। সর্বক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, কবির রসশালায় উপনীত হয়ে সে-বিষয় কবিপ্রত্যয়ে অর্থাৎ সৎ প্রত্যয়ে, শিল্প প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে কিনা। কবির মূল প্রেরণা কোথা থেকে এসেছে—গান্ধীবাদ থেকে না মার্কস্‌বাদ থেকে, সুয়েজের কেলেঙ্কারী থেকে না হাঙ্গেরির রক্তবন্যা থেকে—সে বিচারে আমাদের নানারকম কৌতূহলের নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু কবিতাটি মহৎ বা সার্থক হল কিনা তার উত্তর মিলবে একমাত্র কবিতাতেই, পটভূমি-তথ্যে নয়।

৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশকালে চমক জাগিয়েছিল সেকথা পূর্বে বলেছি। এখন বিচার্য, সে-কবিতাগুলির আবেদন আজও কতটা অপরিবর্তিত, কতটা নির্ভরযোগ্য।

গোড়াতেই বলে রাখি কবিতাগুলির প্রথম প্রকাশকাল থেকেই আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার অনুরাগী। সে কালে তাঁর কাব্যে আমি দেখেছিলাম উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। সেজন্যই আজ এই কবিতাসংগ্রহ পড়ে মনে হচ্ছে যে যদি এই সংগ্রহে সুভাষের কাব্যসাধনার কোনো যতিবিন্দু নির্দিষ্ট হয়ে থাকে (হওয়াই সম্ভব নৈলে কেন এরকম সংগ্রহ প্রকাশিত হবে?) তাহলে লাভলোকসানের একটা সালতামামি হিসাব করা দরকার। পনেরো বছর আগে যা ছিল প্রতিশ্রুতি আজও তা প্রতিশ্রুতিই থেকে যেতে পারে না, তাতে আমরা

খুঁজব পরিণতি, প্রসার, উন্নতি। সুভাষের সমগ্র কাব্যসাধনা আলোচনা করলে দেখতে পাই প্রতিশ্রুতির তুলনায় পরিণতি নূন। "পদাতিক"-এ দেখেছিলাম এক মহৎ কবির সম্ভাবনা, "ফুল ফুটুক" অবধি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে দেখছি সে-কবিস্বশক্তির ক্রমমন্থর নিরুদ্দীপক চর্বণ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে আমি তিনটি সুর শুনতে পাই: ব্যঙ্গাত্মক সুর, চড়াগলার সুর, স্বগতোক্তির মৃদুতর সুর। সুরত্রয়ের সর্বত্র এক অটল প্রত্যয় লেগে আছে, সে-প্রত্যয় মূলতঃ কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কিন্তু কাব্যের স্তরে এসে সে-প্রত্যয় কোনো দার্শনিক তর্কাতর্কির সামিল হয়নি, স্বকীয় বেগভারে পৌঁছেছে অনুভূতির ও মনঃশক্তির সরল সাযুজ্যে। আজকের দ্বিধাবিক্ষুব্ধ চিত্তাবস্থার যুগে এই দৃঢ় প্রত্যয় যেন জঞ্জাল-তাড়ানো হঠাৎ-হাওয়া, কিন্তু, আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও—তখনকার ফলিত জীবনে যে-রাজনৈতিক মতই চলুক না কেন—কবিপ্রত্যয়ের এ হেন বলিষ্ঠতা ও সারল্য কাব্যানুরাগীকে আনন্দ দেবে। তিনটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা কথাটা স্পষ্ট করি—

> হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
> শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার
> আত্মদানের; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার। (৭৯ পৃষ্ঠা)

> আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি,
> খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
> লক্ষ বুকে রয়েছে খনি,
> কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ
> আমরা এই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ। (৪৬ পৃষ্ঠা)

> ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
> মন দাও আজ
> এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
> দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
> টাঙানোয়।
> আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
> —একটুও যার ভাঙা নয়। (২০০ পৃষ্ঠা)

এসব উক্তির সপক্ষে আমি মস্ত কিছু দাবী করছি না, এগুলি মহৎ যুগান্তকারী উক্তি এমন কথা বলছি না, শুধু বলতে চাই যে এহেন প্রত্যয়বচনের স্পষ্টতা ও ঋজুতা—সুভাষের ভাষায় 'সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস'—যে কোনো কাব্যের স্বাগত সম্পদ।

মূল প্রত্যয় সুভাষের কাব্যে গোড়া থেকে শেষ অবধি অপরিবর্তিত, যদিও সে-প্রত্যয়ের বাচনিক প্রকাশ, তার কথার ও ছন্দের ঢং, বদলেছে তিনটি সুরের বিভিন্ন পর্দার খাতিরে।

আমার মনে হয় সুভাষের শ্রেষ্ঠ কুণ্ঠিত ব্যঙ্গ-শাণিত কথনে আর সেজন্যই তাঁর প্রথম গ্রন্থটি কাব্য হিসাবে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তিকর। জীবন-প্রত্যয়ী তরুণ কবি সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখছেন—যে-সংসারের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করেছি এ-প্রবন্ধের গোড়ায়—তাঁর দৃষ্টি স্বদেশে নিবদ্ধ বিদেশও তাঁর দৃকচক্রবালের মধ্যেই, যে-দৃষ্টি একটি বিশিষ্ট

রাজনৈতিক মতবাদ ও সংস্কার প্রভাবে পরিপুষ্ট, তিনি যা দেখেছেন তাতে অনেক রূঢ় মোহভাঙা বেদনাবিম্ব অনুভূতি তাঁর এসেছে আর যেহেতু এসব অনুভূতি তাঁর মূল প্রত্যয়ের একান্তই পরিপন্থী সেজন্যই তাঁর বেদনাবোধ হয়েছে সুতীব্র আর তাঁর কণ্ঠে বিদ্রূপ বেজেছে তীক্ষ্ম সুরে। বিদ্রূপের কয়েকটি নমুনা দেখুন—

> বিশেষত, ভারতবর্ষে একচোটিয়া নেতা গান্ধী। গৌরীসেনী টাকা ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়,—জমিদারী যায় যাক! বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে। (২৭ পৃষ্ঠা)

> (তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়!)
> চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন
> নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট?
> বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
> মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান। (২৩ পৃষ্ঠা)

> শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
> বলব : 'বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়!'
> চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান। (৯ পৃষ্ঠা)

এ-বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ নঙর্থক নয়। বিদ্রূপ করা হয়েছে জীবনকে নয়, জীবনের বিকারকে (অন্তত কবি যাকে বিকার বলে জেনেছেন।) ব্যঙ্গের পাত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে এ-ব্যঙ্গ সদর্থক সত্তার প্রতিষ্ঠাকামী। বহু বিখ্যাত ব্যঙ্গ-রচনারই লেখনরীতি এই : ব্যঙ্গের পাত্রকে বাহবা দেওয়ার ছলে তার তুচ্ছতা প্রকট করা। সার্থক স্যাটায়ার নেহাৎই বৈনাশিক নয়, তাতে নতুন পৃথিবী গড়ার নিশানা আছে, যেমন আছে সুভাষের উক্তিতে : 'ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।' সুভাষের খরশাণ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা অতুলনীয় : উজ্জ্বল ইস্পাতের তন্বী তরবারি যেন প্রখর রৌদ্রে বিদ্যুল্লেখার মতো ঘুরছে অবিরত। এই ব্যঙ্গ-কাব্যে তিন মাত্রার ছন্দের সুচতুর বিন্যাস, মিলের কারসাজি, অপ্রত্যাশিত শব্দের ও বাকরীতির প্রয়োগ, অনুপ্রাস, বলিষ্ঠ ইমেজ ও (সর্বোপরি) ঠাসা তুবড়ির মতো সুসংহত বাক্যবন্ধ জুটে কাব্যের শিল্পমূল্য চমৎকাররকম বাড়িয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার কোন পাঠশালায় বিদ্যার্থী ছিলেন সঠিক জানি না তবে তাঁর কাব্যপাঠে অনুমান হয় সে-পাঠশালায় তিন মাত্রার ছন্দের কৌশল তিনি শিখেছিলেন সুকুমার রায় ও বিষ্ণু দে-র কাছে, প্রাকৃত শব্দ ও বাকরীতির আপাতচটুল প্রয়োগ শিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে, মিলের কারসাজি শিখেছিলেন সুকুমার রায়ের কাছে, অনুপ্রাস শিখেছিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কাছে, কোনো কোনো মৌখিক ছাঁদের কবিতার ঢং (যথা, 'সহজিয়া') শিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীর কাছে। সব বিষয়েই সর্বোপরি অবশ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুভাষের কিছু পূর্বেই বিষ্ণু দে তিন মাত্রায় অসামান্য সাবলীলতা দেখিয়েছিলেন কিন্তু অতিশয় তরুণ কবির হাতেও সে-মাত্রায় কৃতিত্ব অবিলম্ব ও নিঃসন্দিগ্ধ। কয়েকটি ছড়ার ছন্দে (যথা, 'দিয়েন বিয়েন ফু', 'এক যে ছিল রাজা', 'দাঁড়ানো') সুভাষের আশ্চর্য পারদর্শিতা নিশ্চয় ছান্দসিকের প্রশংসার্হ হবে। কতকগুলি মিল রীতিমত চমকপ্রদ—

> সহজিয়া—শুধু জী হাঁ (২০৫)
> বাপ্পুরে—গা ফুঁড়ে (১৬৫)
> ভাগ্নে— ভাগ নে
> দামামা—না মামা
> শুয়ে যে—সুয়েজে (২০৩)
> আজ যে—গ্রাহ্যে (৪৫)
> নিদ্রা—কলাবিদ্যরা (৪৫)

ইংরেজি feminine rhyme-এর মতো এসব মিলের প্রধান গুণ উচ্ছল চটুলতা, হালকা হাসির অথবা বঙ্কিম তুচ্ছতার অভিব্যঞ্জনা এই মিলে। ব্রাউনিং যখন 'গ্র্যামারিয়ন্স্ ফানারল্' কবিতায় fabric ও dab brick মিল লাগিয়েছিলেন তখন সেটা কবিতার গম্ভীর সুরের সঙ্গে নিতান্তই খাপছাড়া হয়েছিল কিন্তু বায়রন যখন 'ডন জুয়ান'-এ নানারকম দ্বি-স্বর ও ত্রি-স্বর মিলের প্রয়োগ করছিলেন, যখন রবীন্দ্রনাথ

> শ্রাবণে ডিপডুটিপনা
> এযে কভু নয় সনা—
> তন প্রথা এ যে অনা—
> সৃষ্টি অনাচার

লিখেছিলেন তখন প্রধানত অপ্রত্যাশিত মিলের সংযোগেই কবিতার হালকা বুনট তৈরি হয়েছিল। সুভাষের উদ্দেশ্য নয় হাসির কবিতা লেখা। অপ্রত্যাশিত দ্বি-স্বর ও ত্রি-স্বর মিলে তিনি নির্দেশ করছেন কথিত বিষয়টি কত তুচ্ছ। 'দামামা—না মামা' 'ভাগ্নে—ভাগ নে' 'শুয়ে যে—সুয়েজে' এ সব মিল-চাতুরী দিয়ে সুয়েজ-পরিস্থিতির অবজ্ঞেয়তা যতটা প্রকট করা গেছে স্ফীতগণ্ড রুদ্ধ বাক্যাড়ম্বরে তার সহস্রাংশের একাংশ সম্ভব হত না। বিদ্রূপগর্ভ কবিতার অবজ্ঞাপ্রকাশের আরেকটি তীর সুভাষের তূণীরে—ছিমছাম ভদ্র শব্দাবলীর মাঝে মধ্যে কটকটে দু-চারটি গাঁওয়ার শব্দ, কিছু প্রাকৃত ইডিয়ম্ ঢুকিয়ে দেওয়া—

> জনান্তিকেই বুলি **কপ্চানো** খাসা তো (১৫ পৃষ্ঠা)

> অর্ধেক চাঁদের মত কী **করুণ চ্যাপ্টা** হয়ে গেছে (২৪ পৃষ্ঠা)

> মৌমাছির মত বসে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
> নিশাচর **ফূর্তির** চড়ায়। (২৩ পৃষ্ঠা)

> মৃত্যুকে ভয় করি **থোড়াই** (৯ পৃষ্ঠা)

> ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে (১৪ পৃষ্ঠা)

> গোটাবে না পাততাড়ি (২০ পৃষ্ঠা)

> স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো (২১ পৃষ্ঠা)

> ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল (২৭ পৃষ্ঠা)

> ধনীদের তো পোয়াবারো (২৭ পৃষ্ঠা)

> সংসার-সমুদ্রে হালে পাই নাকো পানি (৩৭ পৃষ্ঠা)

এ সব প্রাকৃত ইডিয়মের সঙ্গে মিলেছে অনতিপ্রযুক্ত অনুপ্রাস—

নখাগ্রে নক্ষত্রপাল্লী; টাকৈ টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি (১৭ পৃষ্ঠা)

বসন্ত কী আর্য, আহা! এসপ্লানেডে আশ্চর্য জনতা (১৮ পৃষ্ঠা)

পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায় (৩২ পৃষ্ঠা)

ভীড়গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত আমি (৩৭ পৃষ্ঠা)

রূপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে (১৪ পৃষ্ঠা)

স্বস্তিকার স্বস্তিহীন অরণ্য

বাকবন্ধের সঙ্গে মিলেছে অনুরূপ ইমেজ্ বা বাকপ্রতিমা, সংক্ষিপ্ত, কাঠখোট্টা, অ-কাব্যিক—

কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া (৪ পৃষ্ঠা)

শৃগাল বুদ্ধি ভাড়াটে (১৫ পৃষ্ঠা)

বালখিল্য স্বপ্নরা (৫ পৃষ্ঠা)

উল্লাঙুল স্বপ্ন (১৭ পৃষ্ঠা)

মোমের টুপিতে (৪৩ পৃষ্ঠা)

গ্লেসিয়ার দিন (২২ পৃষ্ঠা)

গলিতনখ পৃথিবী (২৫ পৃষ্ঠা)

যমদূত দেয় ডুব সাঁতার (৩৮ পৃষ্ঠা)

সেলায়ের প্রতি সুতোয় লুকোয় লজ্জা (৮ পৃষ্ঠা)

কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো (২১ পৃষ্ঠা)

ভবঘুরে কুকুরের ঠোঁটে
নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর (২৩ পৃষ্ঠা)

অবশ্যই সুভাষের রচনায় কাব্যের গতানুগত বাকপ্রতিমারও অভাব নেই—

হরিণ-সময় লাগামে বাঁধতে পারো (২০ পৃষ্ঠা)

অহল্যা হোক পিচ্ছিল হাতছানি (২১ পৃষ্ঠা)

দূরে দেয় হাতছানি সংঘবদ্ধ মাঠের সবুজ (৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রাক্-পুরাণিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুরধার নখ (২৮ পৃষ্ঠা)

কালের জাহাজ
বাণিজ্য-বায়ুর হাতে শুধুমাত্র ক্রীড়নক আজ (৩৬ পৃষ্ঠা)

পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে (১৬ পৃষ্ঠা)

কিন্তু নিঃসন্দেহে উপরে উদ্ধৃত অ-কাব্যিক বাকপ্রতিমাগুলিই সুভাষের কবিতার বৈশিষ্ট্য, তাঁর কাব্যের নতুন রাগিণীর যথার্থ টঙ্কার। স্বভাবতই তাঁর লেখায় 'লাল' সর্বত্র-উপস্থিত বিশেষণ, 'লাল'-এর ছবি মামুলি। কিন্তু বিশেষণ হিসাবে 'উজ্জ্বল' শব্দটির প্রয়োগ সুভাষের কাব্যে থবই লক্ষণীয়। কিন্তু বিদ্যুপাত্মক কবিতাগুলির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তাদের ঠাসবুননো ভাষা। এই ভাষা-সংহতির উদাহরণ "পদাতিক"-এর অনেক পাতায় আছে, একটি উদাহরণে বিশ্লেষণ স্পষ্ট করা যাক—

ব্যর্থমনোরথ পাণ্ডা; পিণ্ডে তৃপ্তি নেই আর; জাতিস্মর ভূখ;
ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস; পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে। (১৯ পৃষ্ঠা)

এখানে স্বল্পভাষিতার শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, অথবা বলা উচিত স্বল্পতম কথায় গভীরতম অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত। বাঙলা কাব্য, দুঃখের বিষয়, সচরাচর ভাবঘনতায় ঐশ্বর্যশালী নয়। প্রধানত গীতধর্মী বলে বাঙলা কাব্য আবেগপ্রবণ আর সে-আবেগ প্রায়ই উচ্ছ্বাসের ও কথন-বিলাসের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। কোনো কোনো কবিতায় (মোহিতলালের ও সুধীন্দ্রনাথের) প্রচুর তদ্ভব শব্দের সমাবেশে ভাবঘনতার মরীচিকা সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু বিশ্লেষণান্তে বোঝা যায় যে আসলে এসব কবিতায় যে-পরিমাণে ধ্বনি-গাম্ভীর্য বিদ্যমান ভাবসংহতি সে-পরিমাণে নয়। সুভাষ ভাবঘনতা অর্জন করেছেন নির্মমভাবে সমস্ত বাহুল্য ছাঁটাই করে। আঠারো শতকী ইংরেজি কবিতায় পোপ ও তাঁর সমপন্থীগণ ভাষাপ্রয়োগের সেই উৎকৃষ্ট কৌশল শিখেছিলেন যার সাহায্যে স্বল্পপরিসরে অনেক কথা বলা যায়। বলা যায় মানে দ্যোতনা দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলা যায় না—সে পথ প্রত্যক্ষী কাব্যের—বলা যায় সুস্পষ্ট অর্থ-বহতায় ভাষা প্রয়োগ করে। এ-কৌশল সুভাষের পুরোপুরি জানা আছে। সংক্ষিপ্ত শব্দসমাবেশ কখনো কখনো (যেমন উপরে উদ্ধৃত ছত্র দুইটিতে) একটি ভাবের বিভিন্ন দিকগুলিকে একত্র করে, কাব্যের সুর উঁচু থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁছয়। কখনো দুই ছত্রে ভারসাম্য কখনো একই ছত্রের দুই অংশে।

'হা-ঘরে আমরা; মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির', 'রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি', 'ইতিহাস স্পষ্টবক্তা, ভারী ট্যাঁক কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ভাঁড়ারী', 'রাজার কিস্তি মাৎ, সম্প্রতি বেণে বেচাল'—এসব ছত্রে যে-ধাতব পরুষ সুর বেজেছে, যে-স্বল্পবাক ঋজু স্পষ্টভাষিতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বাঙলা কাব্যে অভিনব বলেই আমার বিশ্বাস। এ-ধাতব সুরের উৎস সুভাষের রাজনৈতিক প্রত্যয়ে।

"পদাতিক" থেকে পরবর্তী কাব্যে যতই এগিয়ে যাই ততই এই ধাতব স্বল্পবাক কাব্য বিরল হয়ে আসে, সুরের সংহতি ক্রমে শিথিল হয়ে চলে, কবি যেন মিছিলে মিছিলে জিন্দাবাদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এখন অনাত্মস্থ উচ্চভাষণে পৌঁছেছেন। যিনি একদা এমন সুন্দর সংহত ছত্র লিখেছেন—

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে। (৪ পৃষ্ঠা)

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,

এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি? (১১ পৃষ্ঠা)

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিল মিছিলে মেলাও যদি,
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী। (২০ পৃষ্ঠা)

তিনি এখন এসব ক্যানেস্তারা-পেটানো পদ্য লিখছেন—

সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন—
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির;
মৈত্রীর সঙ্কল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙীন।
অথর্ব নায়ক হবে গদিচ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির। (৫৮ পৃষ্ঠা)

আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছো কে? সরাও।
বাধার দেওয়াল তুলেছো কে? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি। (১৬৪ পৃষ্ঠা)

ফাঁসিকাঠ জেল গ্যাস-গুলী ঠেলে
অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই,
চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি। (১৭০ পৃষ্ঠা)

এখন থেকে সুভাষের কাব্যের একটা বড় অংশ এই রকম তারস্বরী রচনা। কিছু পদ্য আছে যেগুলি নিঃসঙ্কোচেই শ্লোগান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, হয়তো হয়েছেও—

স্লাইক! স্লাইক! শাদাকে করবো কালাপানি পার,
তবে যুদ্ধের শান্তি।
স্লাইক! স্লাইক! শৃঙ্খলে চিড় ধরে, ভিৎ টলে,
মাথা উঁচু করে ক্রান্তি। (৮৩ পৃষ্ঠা)

রক্তের ধার রক্তে শুধবো
কসম ভাই
রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের
জবাব চাই।

লাখো লাখো হাত এক হলে বলো
পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে
লাল ঝাণ্ডাকে? (৮৫ পৃষ্ঠা)

কোথায় যাও?
দমন রাজার
দরবারে।
থামো—
—না।
বাধা দিলেও
—না।
সঙীনে বিঁধলেও
—না। (১৭৬ পৃষ্ঠা)

যতই মুন্সিয়ানা থাক এসব শ্লোগানে, এগুলিকে কবিতা বলা চলে না, সুতরাং কাব্যালোচনায় এদের বাদ দেওয়াই সঙ্গত। এদের বাদ দিয়েও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-সংগ্রহের অনেকখানি অংশই অধিকার করেছে কতকগুলি রচনা যেগুলিকে কাব্যের ডঙ্কা-নিশান বলতে পারি। কবি কখনও আহ্বান জানাচ্ছেন দেশবাসী যেন পরদেশীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, কখনও একটি দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করছেন, কখনও বা শাসাচ্ছেন জনস্বার্থের শত্রুকে,—নানারকমে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সঙ্ঘের কাজ চালাচ্ছেন কাব্যের মাধ্যমে। আমি পূর্বেই আমার এ-বিশ্বাস জ্ঞাপন করেছি যে রাজনীতি কাব্যের সঙ্গত বিষয়বস্তু। অতএব সুভাষ বা অন্য কেউ যদি রাজনীতি ও কবিকর্ম যুগপৎ চালান তাহলে কাব্যপাঠক হিসাবে ভ্রূকুটি করার অধিকার আমার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে-রাজনীতি (বা অপর কোনো নীতি) কবিপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। কোনটি কবিপ্রত্যয় হল আর কোনটি হল না তার কোনো তাপমান যন্ত্র আছে বলে আমি জানি না। শেষ অবধি এসব বিষয়ে প্রত্যেক পাঠকের নিজস্ব রুচিজ্ঞানেই যথেষ্ট মানযন্ত্র মিলবে যদি শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির রুচি সমাণ্ডির সাধারণ রুচির সঙ্গে সমপর্যায়ী হয়ে যায়। সুভাষের ডঙ্কানাদী পদ্যগুলি সম্বন্ধে আমি আপন প্রতিক্রিয়াই জানাতে পারি। এই পদ্যগুলিতে আমি শিল্প-প্রত্যয়ের একান্ত অভাব বোধ করি। সৎ শিল্পপ্রত্যয় স্বতঃ উৎসারিত, বহিরাগত কৃত্রিম উত্তেজনায় তাকে তুলে ধরবার প্রয়োজন নেই। শ্লোগান-ছড়ায় কৃত্রিম তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ঘোষণা থাকবে সেটা স্বাভাবিক, সে-রচনা শ্লোগানই, কবিতা নয়। কিন্তু যে-রচনা কাব্যের মহিমাকামী, তাতে তারস্বরী কথা থাকবে কেন? শিল্পের দিক থেকে অনাবশ্যক এই উচ্চস্বরে আমার সন্দেহ জাগে যে কবিপ্রত্যয়ে কোথাও কিছু গলদ আছে। ফাঁপা কলসে আওয়াজ কিছু বেশিই বেরয়। যেখানে সুভাষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর শিল্পস্পৃহার চেয়ে প্রবলতর, সেখানেই তিনি রাজনৈতিক মিছিলের সুরে ও ভাষাকে কাব্যের ভাষা ও সুর বলে চালাতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর কবিতায় ইতস্তত বহু জায়গায় এমন rant ছড়িয়ে আছে যেগুলিকে বহু সাধ্যেও কবিতা আখ্যা দেওয়া চলে না। চড়াগলার কথা ও উদাত্ত সুর এক জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান', 'ছবি', 'বলাকা' উদাত্ত সুরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' অথবা 'কঙ্কাবতী'তে সুর বাঁধা উচ্চগ্রামে কেননা সেখানে কবির প্রত্যয় থেকে যে-আবেগ জন্মেছে সে-আবেগ স্বয়ং উদ্বেলিত, উচ্চকিত, গম্ভীর অথবা তীব্র। প্রত্যয়, আবেগ, সুর ও ভাষায় সহজ সাযুজ্য ঘটে সার্থক উদাত্তভাষার কবিতায়। আমি যাকে বলছি চড়াগলার কথা, তারস্বরী ডঙ্কানাদী কাব্য, তাতে কবির সুরে (আমি এক্ষেত্রে সুর বলতে tone বুঝছি) আর শিল্পপ্রয়োজনে অসঙ্গতি থেকে যায়, সুতরাং সে-সুর কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত, সহজ সরল নয়। মিল্‌টনের সেটান যখন Powers and Dominions, Deties of Heaven বলে গম্ভীর নিনাদে বক্তৃতা শুরু করেন তখন তাঁর declamatory কথনরীতি ঐ উত্তর নাটকীয় পরিবেশে পুরোপুরি মানানসই। কিন্তু সুভাষের কবিতাগুলির কোনো নাটকীয় পরিবেশ বা কাঠামো নেই, সেগুলি আত্মকথা মাত্র। যে-সুরে এই আত্মকথা মানাতো, তার চেয়ে অনেক চড়া সুরে তিনি বলছেন। বলার ধরন পলিটিক্যাল ডেমাগগির ধরন। রাজনৈতিক বক্তা দিনের পর দিন একই কথা নানা মঞ্চে বলতে বাধ্য হন, একই দিনে একই কথা বারবার বলতেও হয়, বলার সময় মুদ্রাকণ্ঠ হলে চলবে না, বেশ আত্মসচেতন ভাবে কণ্ঠস্বর মেলাতে হবে, প্রতিবার বলার সময় নিজের ভিতরে তাৎক্ষণিক আবেগের সৃষ্টি করতে হয় যাতে সে-আবেগ শ্রোতৃমণ্ডলীতেও পৌঁছয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দিয়ে থাকেন কিনা অথবা শুনে থাকেন কিনা জানি না, তবে আমি তাঁর অনেক কবিতায় পাচ্ছি গণবক্তৃতার rhetorical, declamatory style—অতি-অলঙ্কৃত, স্ফীতকণ্ঠ বচনশৈলী—সেটাই যেন "পদাতিকে"র পরপর্যায়ী কাব্যের প্রধান শৈলীতে দাঁড়িয়েছে। সংকবাব্যের পক্ষে এহেন শৈলী বেশিদিন অবধি চলা শোকাবহ। সুভাষের কাব্যানুরাগী আরও এক কারণে এই বক্তৃতামণ্ডী শৈলীর জন্য আফশোস করবেন। তাঁর উচ্চগ্রামের কবিতাগুলিতে ঘুরে ফিরে একটিমাত্র আবেগই উপস্থিত, আর সেই একটি আবেগকেই স্বরের উচ্চতা দিয়ে বাক্যালঙ্কার দিয়ে যতদূর সম্ভব ভূষিত করা যায় কবি সে-চেষ্টা করেছেন। ফল দাঁড়িয়েছে অতিকথন। "পদাতিকে"র ব্যঙ্গ-শাণিত কবিতাগুলিতে কাব্যের যে সব উজ্জ্বল গুণ বিদ্যমান দেখেছিলাম—বাকসংযম, আবেগসংহতি, বুদ্ধির প্রখরতা—সে সব গুণ পরবর্তী কাব্যে প্রায় অদৃশ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের দীর্ঘ অতিকথনবিলাসী আবেগপরায়ণ রচনাপদ্ধতির গতানুগতিকতায় আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এই স্ফীতকণ্ঠ বচনশৈলীতে শুধু যে দশবছরের কবিতা দুর্বল হয়েছে তা নয়, আরো কয়েকটি অনুমান এর পরে সম্ভব। আশঙ্কা হয় সুভাষের কাব্যবিচারও কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে। নতুবা নাজিম হিকমতের এতগুলি অযোগ্য পদ্যের অনুবাদ তিনি কেন করতে গেলেন?

তুমি মাঠ
আমি ট্র্যাক্টর
তুমি কাগজ
আমি টাইপরাইটার
বধূ আমার,
আমার সন্তানের জননী,
তুমি গান
আমি গীটার।

এতই অপদার্থ এ-রচনা যে এ পড়ে হাসিও পায় না। এই নিখুঁত অপদার্থ লেখাটিকে

আদৌ অনুবাদ করার কথা ভাবতে পেরেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় কারণ খুবই সম্ভবত এর চড়া সুরে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। বিচারশক্তির শিথিলতার পরিণামে স্বকীয় কাব্যসৃষ্টির দুর্বলতা।

সুভাষের এই কবিতাগুলি পড়ে আরেকটি কথাও মনে জাগে। এ-প্রবন্ধের দীর্ঘতম অংশে আমি রাজনীতি ও কাব্যের সম্পর্কের কথা বলেছি। সে-সম্পর্কের পুনরুল্লেখ এখানে করতে হচ্ছে। আমি বলেছি আমার বিশ্বাসে অন্য যে কোনো বিষয়বস্তুর মতোই রাজনীতিও কাব্যসগত হতে পারে। আসল কথাই শিল্পপ্রত্যয়। কিন্তু এও সত্য যে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংক্রান্ত কাব্য আজ অবধি মহৎ কাব্য হয়নি, এমন কি সার্থক ও সুষ্ঠুও হয়নি। ভিক্টরীয় কবিদের (রাজনীতি-অনুরক্ত) অধিকাংশই ছিলেন নগণ্য কবি, কিন্তু যখন দুয়েকজন শক্তিশালী কবিও রাজনৈতিক প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হলেন—শক্তিশালী এ-অর্থে যে কাব্যের অন্য-ক্ষেত্রে তাঁরা প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—তখন তাঁরাও হলেন বিফলপ্রযত্ন। উইলিয়ম্ মরিসের একটি সোশ্যালিস্‌ট্ কবিতা পড়ুন—

What is this, the sound and rumour? What is this
that all men hear,
Like the wind in hollow valleys when the storm
is drawing near,
Like the rolling on of ocean in the eventide of fear?
'Tis the people marching on.
(Morris—*The March of the Workers*)

এখানেও সেই বক্তৃতামণ্ডী যাত্রাগানের সুর। বস্তুত কোনোপ্রকার ডেমাগগি, কোনো কৃত্রিম-সঞ্চারিত উৎকণ্ঠ আবেগই সৎ কাব্যের জনক নয়, তা রাজনৈতিক তালঠোকা বক্তৃতা হোক অথবা ধর্মোপদেশ হোক, শিক্ষকের উপদেশ অথবা উকিলের ওকালতি হোক। হতে কোনো তর্কশাস্ত্রীয় বিঘ্ন নেই, বিঘ্ন শিল্পপ্রত্যয়ে। অধ্যাপক অলিভার এল্‌টন্ অনেক পঠন পাঠনের পরে বলেছিলেন "জানি না কেন, আমার মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক কাব্য পোকায়-খাওয়া শস্যের মতো।" রাজনৈতিক কাব্যের এতাবৎ এই অবস্থা হয়েছে কেননা ডেমাগগির ধাপ থেকে তাকে সৎ শিল্পপ্রত্যয়ের ধাপে নিতে কবিরা এখনো পারেননি। কাব্যের একটি জরুরি সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। কোন উপায়ে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সৎ শিল্প-প্রত্যয়ে উন্নীত হতে পারে, সে-প্রত্যয়ে কবির আবেগ ও শিল্পের ছাঁদ কী ভাবে একীভূত হতে পারে? সে-একাত্মতা চড়া সুরের ভাষণে মেলে না, সব কবির দৃষ্টান্তে তার প্রমাণ পাচ্ছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও চড়া সুরের নিস্ফলা আঙ্গিকে আটকে গেছেন, তাঁর ব্যর্থতার মূল আঙ্গিকের দোষে, সম্ভবত তাঁর প্রত্যয়েরও দোষে। দোষ যেখানেই থাক, সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে যে রাজনৈতিক কাব্যের মৌল সমস্যা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতেও সমাধান পেল না।

৫

সৌভাগ্যবশত সুভাষের কাব্যে তৃতীয় একটি সুরও আছে, সে-সুর স্বগতোক্তির সুর, সে-সুরে সুভাষের অনন্যতা নেই কেননা সে-সুর চিরকাল ধ্যানী কবিচিত্তের গীতধর্মী সুর তবুও সে-সুরের খেলায় সুভাষ উৎকৃষ্ট কবি। জন স্টুয়ার্ট মিল্ বলেছিলেন Eloquence

is *heard*, poetry is *overheard*,—ভাষণ আমরা শুনি আর কবিতা আড়ি পেতে শুনি। সুভাষও বলেছেন "সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন, নিঃসঙ্গ।" তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলি শ্রোতার উদ্দেশে ভাষণ, তাঁর স্বগতোক্ত কবিতা অন্যরকম। এ-হেন কবিতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি উপরে অনেক দিয়েছি, এখানে আরো কয়েকটি দিচ্ছি—

দিকে দিকে ছুটে যায় দূত
জয়ের পতাকা হাতে,
মাটি পাতে সবুজ আসন,
দু হাতে পরায় সূর্য
জীবনের মাথায় মুকুট।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে মেলে পাখা (৬৭ পৃষ্ঠা)

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ।
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো করে বসে আছে পিলসুজে। (১৭৯ পৃষ্ঠা)

ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক
আর আমরা জলের কলে শুনি—
চোখ বড়ো-বড়ো করা আকাশের নিচে
পাথরের নুড়িতে নুড়িতে লাফিয়ে-পড়া
এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামাল নদীর
কলতান। (২০৬ পৃষ্ঠা)

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র;
দেয়ালে গুলীর দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত। (২১৮ পৃষ্ঠা)

কবির ধ্যানী আত্মমগ্ন চিত্তে তাঁর জড়জাগতিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলি অনায়াস-সংলগ্ন হয়ে একই সময়ে ভাবাবেগ ও সুরের জাল বুনেছে, সে জালে এসেছে দ্যোতনাময় শব্দ আর বাকপ্রতিমা, এসেছে সুরের বিস্তার, এসেছে কল্পনার প্রসার। জানি না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য এর পরে কোন্ মোড়ে যাবে। তাঁর ব্যঙ্গ-শাণিত কাব্যের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী, আর অন্য যেখানেই তাঁর দুর্বলতা থাক না, উপরে উদ্ধৃত অংশগুলিতে ও অন্যত্র যে মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অমলেন্দু বসু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। মূল্য ৪·০০। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ১২।

স মা লো চ না

Literary Biography. *By* Leon Edel. Rupert Hart-Davis. London. 12/6.

বর্তমান শতকে জীবনী সাহিত্যের আঙ্গিক ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর একাধিক খণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ "সরকারী" জীবনীগুলি প্রমাণের দলিলে কণ্টকিত; জীবনীকার সর্বদাই নিজেকে আড়ালে রেখেছেন;—বস্তুকেন্দ্রিকতা ছিল তাঁর লক্ষ্য। তথ্যের নীচে জীবনের আসল রূপ প্রায়ই চাপা পড়ে যেত; যাঁর জীবনী তাঁকে দেখতে পাই বাহিরের ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁর মনোজগতের উত্থান-পতনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জীবন চরিত থেকে পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পর সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা দিল এবং তার পটভূমিকায় এ ধরনের জীবনীর প্রতি পাঠকের আগ্রহ হ্রাস পেল।

জীবনী রচনায় নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন লিটন স্ট্র্যাচি, ১৯১৮ সালে। তাঁর "এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ান্‌স্", "কুইন ভিক্টোরিয়া" এবং "এলিজাবেথ অ্যাণ্ড এসেক্স" প্রভৃতি জীবনীগ্রন্থগুলির বিপুল জনপ্রিয়তা এই নতুন ধারার সার্থকতা প্রমাণ করল। উপন্যাসের কতকগুলি গুণ তাঁর জীবনীর মধ্যে পাওয়া যায়। উপন্যাসের ভঙ্গীতে জীবনী লেখার সূচনা তিনিই করেছেন। অথচ স্ট্র্যাচির রচনায় নিছক কল্পনাপ্রসূত কাহিনী সৃষ্টির প্রয়াস নেই। কাল্পনিক কথোপকথন বা দৃশ্য যেখানে আনা হয়েছে সেখানে তাদের সত্য বলে চালাবার চেষ্টা তিনি করেননি। মূলতঃ তাঁর জীবনী তথ্যনির্ভর। কিন্তু ঔপন্যাসিক যে ভাবে কৌতূহলাবিষ্ট পাঠকের সামনে তাঁর নায়ক নায়িকাকে সুকৌশলে উন্মোচিত করেন ঠিক তেমনি মনোজ্ঞ রীতি স্ট্র্যাচিও অবলম্বন করেছেন। তাই উনবিংশ শতাব্দীর চরিত-গ্রন্থের মতো তথ্যের শুষ্ক মরুভূমি পাঠক ও জীবনীর নায়কের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে না; প্রথম থেকেই পাঠক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

স্ট্র্যাচির পরে জীবনী সাহিত্যে যাঁরা বৈচিত্র্য এনেছেন তাঁদের মধ্যে আঁদ্রে মরোয়া, এমিল লাডউইগ, স্টেফান ৎস্‌ভাইগ, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, আরভিং স্টোন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা জীবনী সাহিত্যে যে নতুন যুগ এনেছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (১) রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসার; (২) তথ্যকে মুখ্য না করে শিল্পরূপকে প্রাধান্য দেওয়া এবং (৩) জীবনী রচনায় উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োগ করা।

শেষোক্ত কারণই যে জীবনীসাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যে আজকাল গল্প-উপন্যাসের পরেই জীবনী সাহিত্যের স্থান। জীবনী ও উপন্যাসের মধ্যে সীমারেখাটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। উপন্যাসের নিকটতম জীবনী সমারসেট মমের "দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স।" জীবনীকে এখানে চেনাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও জীবনী সাহিত্যের উপর উল্লেখ-যোগ্য সমালোচনা গ্রন্থের অভাব রয়েছে। আঁদ্রে মরোয়া ও হ্যারল্ড নিকলসনের বই দুটি বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো এ বিষয়ের প্রামাণ্য আলোচনা। লিওন ইডেল তাঁর নতুন বইয়ে জীবনী সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যিকের

জীবনী রচনার পদ্ধতি কি, এই হল তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু। ইডেল হেনরি জেম্‌সের চরিতকার এবং মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস সম্বন্ধেও একটি বই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর আলোচনার পশ্চাতে অভিজ্ঞতার দাবি আছে। যদিও সাহিত্যিকের জীবনী রচনার বিভিন্ন স্তর ও কৌশল এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়, তথাপি আমার মনে হয় সকল শ্রেণীর জীবনী সম্বন্ধেই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রযোজ্য হতে পারে।

ইডেল জীবনীর সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"A biography is a record, in words, of something that is as mercurial and as flowing, as compact of temperament and emotion, as the human spirit itself."

পারদের মতো সদা সঞ্চরণশীল এবং মেজাজ ও অনুভূতির সমষ্টি মানুষের জীবনকে ভাষায় রূপ দেওয়া কঠিন কাজ। কঠিনতর কাজ সাহিত্যিকের জীবনী রচনা করা। কারণ এ ধরনের জীবনীতে আমরা দেখতে চাই লেখকের মনোজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি। বাহিরের ঘটনা লেখকের জীবনে প্রধান নয়; সংসারের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর হৃদয়ে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যিকের জীবনী সার্থক হতে পারে না। অথচ জীবনী লেখকের পক্ষে অন্য একজনের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তার সত্য রূপটি প্রকাশ করা সহজ নয়। এই জন্যই অন্যান্য শ্রেণীর জীবনীর তুলনায় সাহিত্যিকের জীবনীরচনা কঠিন কাজ।

লেখকের জীবন সম্বন্ধে পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ আছে। রোমাণ্টিক যুগের গোড়া থেকেই এই আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যত বাড়ছে, ততই লেখকের জীবন নিয়ে পাঠকরা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে। যে এমন বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে পারে তার নিজের জীবন না জানি কী অপরূপ! সৃষ্টির উৎসকে জানবার এই কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীনকালে সাহিত্যে যখন বস্তু-কেন্দ্রিকতার প্রাধান্য ছিল, তখন লেখককে জানবার এমন আগ্রহ ছিল না। ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্সপীয়র প্রভৃতির জীবনী আমাদের সামান্যই জানা আছে।

নিছক কৌতূহল ছাড়া সাহিত্যের প্রকৃত রসোপলব্ধির জন্যও লেখকের জীবনী জানা প্রয়োজন। যত সাবধানী লেখকই হোক না কেন রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটে। তাই জীবন জানা থাকলে লেখকের শিল্পকর্মের পূর্ণ রসোপলব্ধি সম্ভব হয়। অবশ্য আজকাল একদল সমালোচক বলেন যে, প্রকৃত শিল্প শিল্পীর জীবননিরপেক্ষ। শুধুই মা'র আঁচল ধরে ঘুরলে ছেলের যেমন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা থাকে না তেমনি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বে যদি শিল্প উঠতে না পারে তাহলে তা মহৎ নয়। শিল্পকর্মের নিজস্ব পরিচয় থাকবে,—সে পরিচয়ে স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো স্থান নেই। হেনরি জেমস এই প্রসঙ্গে বলেন,

". . . the life and the works are two very different matters, and an intimate knowledge of the one is not at all necessary for the genial enjoyment of the other."

একালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের যুগে একথা যথার্থ বলে মনে হয় না।

ডঃ ইডেল দেখিয়েছেন যে চরিতকারকে মোটামুটি পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথম হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। কার জীবনী লিখব? যেখানে অপরের নির্দেশে জীবনী লিখতে হয় সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু লেখক স্বাধীনভাবে একটি জীবনকে যখন

বেছে নেয় তখন বুঝতে হবে এই জীবনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে। চরিতকার তার নায়কের মধ্যে নিজের জীবনের আংশিক প্রসার দেখতে পায় বলেই আত্মীয়তাবোধ জাগে। এর ফলে চরিত্রাঙ্কণে স্বভাবতঃই সজীবতা ও আবেগ ফুটে ওঠে। শেলীর আবেগ-উদ্বেল জীবনের মধ্যে মরোয়া নিজের যৌবনোচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন বলেই "আরিয়েল" লিখেছিলেন। মরোয়া নিজেই বলছেন,

". . . it seemed to me indeed that to tell the story of this life would be a way of liberating me from myself."

কিন্তু চরিতকারের যদি নায়কের প্রতি অন্ধ আসক্তি থাকে তাহলে জীবনী শুধু ভক্তের প্রশস্তিতে পরিণত হবে। ফ্রয়েড এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

ডঃ জনসনের অভিমত ছিল যে,

"nobody can write the life of a man but those who have eat and drunk and lived in social intercourse with him."

এদিক থেকে বস্‌ওয়েলকৃত তাঁর জীবনীর তুলনা নেই। ভিক্টোরিয়ান যুগের অনেক বিখ্যাত জীবনী আত্মীয় কিংবা অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরের লেখা। জনসনের মত অনুসারে জীবনী রচনার অধিকার শুধু সমসাময়িক লেখকের। ব্যক্তিগত পরিচয় প্রথম শ্রেণীর জীবনী রচনায় যে অপরিহার্য নয় তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বস্‌ওয়েলের মতো বিশেষ এক শ্রেণীর চরিত-কারের পক্ষেই ব্যক্তিগত পরিচয় অত্যাবশ্যক।

জীবনীর নায়ক নির্বাচন করবার পর চরিতকারের কাজ হল তথ্য সংগ্রহ করা। একালের লেখকদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। চরিতকার গোয়েন্দার ঔৎসুক্য নিয়ে তথ্য সঙ্কলন করতে শুরু করেন। একটি জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। চরিতকারের সঙ্গে সেই জীবনের প্রায়ই বড় রকম ব্যবধান থাকে। সে ব্যবধান সময়, সমাজ, ধর্ম ও ভৌগোলিক দূরত্বের। জীবনীর নায়কের অনেক আচরণের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। চরিতকারের নিকট এগুলি হল বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য চরিতকার তথ্য সংগ্রহের রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু করেন।

বর্তমানে খ্যাতনামা লেখকদের জীবন সম্বন্ধে তথ্যের অভাব হয় না। লেখকের নিজের রচনা, তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখা, সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদির টেপ রেকর্ডিং প্রভৃতি প্রচুর সংবাদ সরবরাহ করে। এবার চরিতকারের কাজ হল সংগৃহীত তথ্যগুলির বিচার। কোনগুলি নির্ভরযোগ্য, কোনগুলি নয়; কোন তথ্য জীবনীতে ব্যবহার করা হবে, কোন তথ্য করা হবে না। এই বিচারের উপর জীবনীর মূল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। স্টেফান ৎস্‌ভাইগ সাহিত্যিকের জীবনী রচনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় ইডেল তাঁর রচনা থেকে কোনো দৃষ্টান্ত দেননি। ৎস্‌ভাইগ তাঁর নায়ক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য সংগ্রহ করতেন। দৈনন্দিন খরচার হিসাব ও ধোবার খাতাও ছিল তাঁর কাছে মূল্যবান দলিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দিনের পর দিন কাটাতেন তুচ্ছ সংবাদ সংগ্রহের জন্য। নায়কের জীবনের সম্ভাব্য সকল খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে সামনে রাখতে হবে। এগুলি হল জীবনীর কাঁচা মাল। জীবনকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের অর্ধেক হয়ত বাতিল হয়ে যায়। এমিল লাডউইগের ছিল ভিন্ন পদ্ধতি। তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করতেন প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যের উপর। নতুন তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাঁর ব্যগ্রতা ছিল না।

জীবনী রচনার পরের ধাপ হল নির্বাচিত তথ্যগুলির মনোবিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা। চরিতকার নায়কের অন্তরে প্রবেশ করে তথ্যগুলি দেখতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে চরিতকার লেখার সময় নিজেকে বিস্মৃত হয়ে নায়কের বাস্তিত্ব গ্রহণ করতে পারলেই জীবনী সার্থক হতে পারে। বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকে দেখানোর মধ্যেই চরিতকারের কৃতিত্ব।

চরিতকারের সর্বশেষ দায়িত্ব হল তাঁর নায়কের জীবনকে একটি বিশেষ যুগের পট-ভূমিকায় সংস্থাপিত করা। সমসাময়িক কাল ও পরিবেশকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে কোনো জীবনই যথার্থরূপে ফুটে উঠতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বড় বড় জীবনীগুলির নাম থেকেই বোঝা যেত জীবনের উপর কালের প্রভাব। যেমন, *Life and Times of Milton*, "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", ইত্যাদি। ব্যক্তির জীবনী একটি জানালা,—যে জানালা দিয়ে বৃহত্তর জীবনকে দেখা যেতে পারে। চরিতকার যদি এই জানালাকে পাঠকের সামনে সম্পূর্ণরূপে খুলে দিতে পারেন তাহলেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক।

স্বল্প পরিসরে ডঃ ইডেল জীবনী রচনার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Pattern of the Post-War World. *By* Cordon-Connell Smith. Penguin Special. *3s. 6d.*

পুস্তক পরিচিতি আপাততঃ মূলতুবী রেখে সুরুতে একটা গল্প বলা যাক। এটা গল্প হলেও সত্যি, এবং এর মর্মার্থ আজকের পৃথিবী সম্পর্কে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। অফিসের কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বাড়ী ফিরে আরাম কেদারায় বসে খবরের কাগজখানা নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর ছোট্ট মেয়ে এসে বলল, "বাবা, একটা গল্প বলো।" ভদ্রলোক তখন গল্প বলবার মতো উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। অথচ মেয়ের আবদার এড়ানো সহজ নয়। চট্ করে ভদ্রলোকের মাথায় একটা ফন্দী এল মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিদায় করবার। খবরের কাগজখানায় পৃথিবীর একটা মানচিত্র ছিল আর যে সব এলাকায় নানা রকম অশান্তি, গোলমাল সেগুলি পৃথিবীর মানচিত্রে তাঁর চিহ্নিত ছিল। মানচিত্রখানা কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে বললেন, "যাও দেখি লক্ষ্মীটি, সবগুলো টুকরো ঠিকমত সাজিয়ে জোড়া দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রখানা তৈরী করে আনো ত।" মেয়ে খুব খুশী, চমৎকার "জিগ্‌স পাজ্‌ল"! মানচিত্রের টুকরোগুলি নিয়ে মেয়েটি চলে গেল। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যাক অনেকক্ষণের মতো মেয়ের গল্প শোনার আবদার ঠেকিয়ে রাখা গেল। তা গেল না কিন্তু। খানিকক্ষণ পরই মেয়েটি মানচিত্রের টুকরোগুলি জোড়া দিয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। "সে কি? এর মধ্যেই হয়ে গেল?" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়ে উত্তর দিল, "হাঁ, বাবা, তবে তোমার ঐ পৃথিবীর মানচিত্র ভারী বিশ্রী গোলমেলে। টুকরোগুলো কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। তার পর দেখি কি, মানচিত্রের উল্টো পিঠে একটা মানুষের ছবি। তখন টুকরোগুলো উল্টে নিয়ে মানুষের ছবিগুলি জোড়া দিয়ে ফেললাম। মানুষের ছবিটা ভারী সোজা। ওটা জোড়া দিলাম অম্নি উল্টোপিঠে তোমার পৃথিবীর মানচিত্রটাও মিলে গেল।" উপকথা

হলেও এটা রূপকথা নয়। গল্পটি বলেছেন আমেরিকান অধ্যাপক উইলিয়ম মান্ডার সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে। মান্ডার বর্তমানে হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। তাঁর চমৎকার প্রবন্ধটির নাম—'পূর্ব ও পশ্চিম—অর্ধসত্যে বিভক্ত এক পৃথিবী'। কনেল-স্মিথের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছকে চোখ বুলাতে বুলাতে বার বার সেই ছোট্ট আমেরিকান মেয়েটির সহজ দৃষ্টিতে দেখা মানুষের ছবিখানির কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর ছক খাঁজে খাঁজে মেলানো কী অসম্ভব হতবুদ্ধিকর ব্যাপার। আর মানুষ? ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সবদিকের, সব দেশের মানুষকেই মেলানো যায়। হয়তো এটা দুরাশা, হয়তো অসম্ভব কল্পনা অথবা সেই চিরপুরাতন কাহিনী যার বিস্মৃত সূত্র হল, "ভ্রাতরো মানবঃ সর্বে, স্বদেশো ভুবনত্রয়ং"।

আপাততঃ রূঢ়বাস্তব হিসেবে কনেল-স্মিথের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছকের উপর থেকে চোখ ফেরানোর উপায় নেই, মন যাই বলুক না কেন। তবে "যুদ্ধোত্তর" কথাটা নিয়েই গুরুতর আপত্তি উঠতে পারে। কনেল-স্মিথের "যুদ্ধোত্তর" ছকের এক প্রান্তে ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্ প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় ১৯৪৪-৪৫ সালে, অপর প্রান্তে সুয়েজ যুদ্ধ ১৯৫৬ সালের অন্তিমকালে। স্মিথ "যুদ্ধোত্তর" শব্দটি ব্যবহার করেছেন মামুলী অর্থে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত যে অস্থির বিদ্যুৎ-গর্ভ পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাকে কেবল সংকীর্ণ অর্থেই যুদ্ধোত্তর বলা যায়। ভার্সেইএ প্রথম মহাযুদ্ধের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়েছিল, না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নতুন খাতা মহরৎ হয়েছিল, এ-নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে। তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ যদি বার্লিনের পতনের সঙ্গে হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম মহড়া সুরু হয় ইরানের ব্যাপারে সোভিয়েট এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রকাশ্য রেষারেষিতে। তার পরের "যুদ্ধোত্তর" দশ-বারো বৎসরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা, আর সে ইতিহাসের শিরোনামা হল "ঠাণ্ডা যুদ্ধ"। কনেল-স্মিথ এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছক এঁকেছেন যথাসম্ভব সন্তর্পণে। দশটি পরিচ্ছেদে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গত দশ-বারো বৎসরের আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহের বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ। এর মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই। লেখক বিতর্কমূলক মন্তব্য ও মতামত যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। তবে "ঠাণ্ডা যুদ্ধের" উদ্ভব তিনি যে রকম ছকে ফেলেছেন তা সকলের কাছে যথার্থ ও যুক্তিসংগত মনে না হওয়াই সম্ভব। "দূর প্রাচ্যে বিপ্লব", "দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদ, কম্যুনিজম এবং নিরপেক্ষতাবাদ" সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সংকলন। "মধ্যপ্রাচ্যে সংকট" ও "আফ্রিকা এবং বর্ণসমস্যার" আলোচনা লেখকের সাবধানী উদারপন্থী মনোভাবের পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপের ঐতিহাসিক প্রাধান্য কমছে, এশিয়া-আফ্রিকার জনজাগরণ শক্তি-সাম্যের মামুলী হিসাবে গরমিল ঘটাচ্ছে, এসব বিষয় কনেল-স্মিথ সংক্ষেপে অথচ বেশ আন্তরিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

শেষ অধ্যায়টিই লেখকের এবং বইখানির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছক অনেকের কাছে মূঢ়তায়, অর্থহীনতায় অথবা ভয়ঙ্কর অর্থ-সম্ভাবনায় নৈরাশ্যজনক মনে হতে পারে। তবে তাঁরাও কনেল-স্মিথের শেষ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি পড়লে হয়তো কিছুটা উপকৃত হবেন। মুস্কিল এই যে, এই পারমাণবিক বিভীষিকায় বিহ্বল পৃথিবীতে কোনো সিদ্ধান্তই শেষ নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছক হয়তো আর একটি যুদ্ধ এবং মহাবিনাশের প্রস্তুতি পর্বের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তবে একেই অমোঘ

এবং অলঙ্ঘনীয় পরিণাম বলে ধরে নেওয়া যায় না। উপসংহারে কনেল-স্মিথের উক্তি স্মরণীয়, "The West must reconcile itself to the transitory nature of its period of domination over non-European peoples ; must accept that it has passed in Asia and is passing in Africa. For the truth of this is manifest in the pattern of post-war world".

সরোজ আচার্য

বারো ঘর এক উঠোন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। কলিকাতা, ৭। মূল্য ৬·৫০ ন. প.

এক এক সময় এত হাওয়া থাকিতেও আমরা হাঁফাইয়া উঠি, নিজেদের জন্য অতিকায় দুঃখ আসিয়া দেখা দেয়। পঞ্চতন্মাত্রা কল্পনাবৎ হইয়া দাঁড়ায়। এই সত্যটুকু বুঝিতে বড় প্রাণে লাগে যে দীর্ঘশ্বাসের অস্থি দিয়া তৈয়ারী আমাদের জীবন। এ জীবন চিরদিনই মৃত। একথা স্মরণ করিয়া মুরশেদ হই না। এই মৃত জীবনটিকে লইয়া ছেলেখেলার অন্ত নাই; কে সেই ছেলেখেলায় প্রমত্ত এ কথা লইয়া বহু তর্ক আছে কিন্তু এখানে তার মীমাংসা নাই।

লেখক এই সত্যের মীমাংসার দরজায় দাঁড়াইয়া আধুনিক হিসাবে নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পাইলেন। "একটি মানুষ বাড়লে মনে হয়, পরমায়ু আরো কয়েক ঘণ্টা কমল" (২৮ পৃষ্ঠা) এবং পরে "পরম নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা, শান্তি ও অনন্ত সুখ স্বর্গেই সম্ভব—মাটির পৃথিবীতে নেই, থাকবেও না" (৪৪ পৃষ্ঠা)। এই সকল অমোঘ উপলব্ধি এড়াইয়া পুনঃ পুনঃ চাতুর্য দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। ফলে চরিত্রগুলির প্রতি ভালবাসা অসম্ভব ক্ষুণ্ন হইয়াছে। অবশ্য এই সূত্রে বলা দরকার যে ইহা নানা কারণেই ঘটিয়াছে। নিছক জীবনকে কতিপয় লেখকই দেখিতে পান, নিঃসন্দেহে বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁহাদের মধ্যে একজন, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা ভঙ্গির জন্যই সেই সত্যদর্শন বিকলাঙ্গ হয়, নিস্ফলতার অন্য কারণ এই যে সাহিত্য ধর্ম রক্ষার্থে কতক মনগড়া কল্পনা আনিয়া নিজের সরল অভিজ্ঞতাকে দোষ দুষ্ট করেন। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারি যে লেখকের সাহসের অভাব ঘটিয়াছে। দুর্জয় সাহস না থাকিলে এইরূপ সুখ দুঃখের কথা বলা অসম্ভব। মাঝে মাঝে লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন মানুষ ত্রিবিধ দুঃখ পায়। তাহারা কাঁদে। ইহাতে একথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় না যে লেখকের ভাবপ্রবণতা নাই, তিনি রুক্ষ। প্রতি পাতায় চা-পান দীর্ঘশ্বাস আছে। পাঠকের মনকে গামছা-নিঙড়ানো করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুশ-গন্ধী আতুরতা সর্বত্র ছাইয়া আছে।

লেখক ছোট গল্পে দক্ষ, জৈব-চেতন গল্প লিখিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে মানুষ আহার-নিদ্রা-মৈথুনশীল বলিয়াই তাঁহার সকল ক্ষেত্রে মনে হইয়াছে।

উপন্যাসের পটভূমিকা একটি বস্তি। কিন্তু বস্তি বলিতে যাহা বুঝায় ইহা সেইরূপ নহে "এটা বস্তি হলেও ভদ্রলোকের বস্তি"—(৩৫ পৃষ্ঠা) এবং এখানে "হ্যাঁ এখানে সবাই মফঃস্বলের হোক, কোলকাতার হোক যথেষ্ট শহুরে হাওয়া গায়ে মেখে বিপদে পড়ে এসে টিনের ঘরে বাসা বেঁধেছে। বা-বা! দেখছো তো পাউডার সাবান এসেন্স-এর অভাব যাচ্ছে

কখনো! কি সিনেমা দেখার, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার। নামে বস্তি। কিন্তু কোনো কোনো ঘরের প্রগতির ঠেলা বড় শহরকে হার মানিয়ে দেয়।"

এই বস্তিবাসী লোকের মধ্যে স্কুল মাষ্টার, হোমিওপ্যাথ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শিবনাথ ও তার বি.এ. পাশ স্ত্রী। কে. গুপ্ত, ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি এবং কে. গুপ্ত ইনি মার্চেণ্ট কোম্পানীর প্রত্যহ পাতলুন ভাঙা (গরমকালে) সাহেব ছিলেন। কে. গুপ্ত আজ বস্তিবাসী, কারণ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেন, "বিলাতী মার্চেণ্ট অফিস যখন ঠেলা দেয় আকাশে ওঠে। যখন পড়ে তখন কি ভাঙে, কি যায় তার হিসাব থাকে না। কত মূল্যবান রত্ন রাস্তায় ড্রেনে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি যাচ্ছে।" কে. গুপ্তর স্ত্রী এই ভাগ্য বিপর্যয় সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কে. গুপ্ত অতিমাত্রায় শিক্ষিত। ইনি জেরার্ড মার্নলি হপকিন্স আবৃত্তি করেন, পরের পয়সায় মদ খান। তাঁর পুত্র আছে, কন্যা বেবীর বয়ঃসন্ধিকালে ফ্রক ছিঁড়িয়া যায়। মেয়েটি লরেটোতে পড়িত। ছেলে রুণ্দ্র পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে যখন থাকিত তখন সিদ্ধি (ভাঙ) (৯৪ পৃষ্ঠা) কি চিনিত। বাঙলা উপন্যাসে এইরূপ চরিত্র নূতন নহে। এক উপন্যাসে পড়িয়াছিলাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র ঘোড়ার গাড়ী চালাইতেছে। অবশ্য পুরুষের ভাগ্যের কথা লইয়া যদি চিন্তা করি তাহা হইলে দুঃখের কিছু থাকে না। নলরাজার কথা স্মরণ করিলে বুদ্ধি ভ্রংশ হয় না।

চরিত্রগুলি প্রায়ই এইরূপ। সভ্যতার ধ্যান ধারণা বর্তমান, বস্তিবাসের কষ্ট ইহাদের নাই। কারণ সত্য বলিতে যে কাণ্ড শান্ত গ্রামাঞ্চলে ঘটিয়া থাকে, যে দুর্যোগ দেদীপ্যমান খাড়া বস্তিতে (ফ্ল্যাট বাড়ী) দেখা দেয়, যে ঘৃণ্য মন রাজপ্রাসাদেও উঁকি মারে এখানেও তথৈবচ অবস্থা। অতএব, "ভাল লাগছিল না শিবনাথের এখানকার লোকগুলোকে। যেন কি এক অদ্ভুত কথা তারা তার কানে তুলে দিতে সারাক্ষণ গলা বাড়িয়ে আছে, যেন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তারা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, টেনে নিতে চাইছে, নিজেদের মধ্যে নিজেদের নোংরামি, কুশ্রীতা, বীভৎসতার গভীর পঙ্কে।"

বলা বাহুল্য, শিবনাথ এখানে বেশ মানিয়ে গেছে, বনমালীর দোকানে আড্ডায় এবং প্লাষ্টিকের তৈজস কেনায়। এবং তার স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন চেষ্টাই সে করে নাই। শিবনাথের ইত্যাকার উক্তি খুব যুক্তিযুক্ত নহে এমন কিছু সে দেখে নাই যাহাতে তাহার মনে এই সকল কথা উদয় হইবে।

ইত্যাকার বাণীদান পাঠককে বিমূঢ় করে যথা বিধুবাবু প্রমুখাৎ "না—আমার বক্তব্য ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশনের যোগ বিয়োগ কষে সমাজ বিজ্ঞানীরা আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আঁকুন, আমরা তো চোখের ওপর দেখছি আমাদের আধুনিক সমাজটা কি দাঁড়িয়েছে, কেমন এর চেহারা হচ্ছে দিন দিন, রেসিডেন্সীয়াল হাউসের অভাব, দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা তো আছেই এদিকে এই ডামাডোলের বাজারে, ভাল মন্দ ইতর ভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মিশে জগা খিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই লোয়ার মিডল ক্লাশ সোসাইটি। কার ভেতর কি আছে, কেমন প্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই।" (২৭ পৃষ্ঠা) এ উক্তি কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা পাঠক সাধারণই বলিতে পারেন। লেখক হয়ত বলিতে চাহেন যে লোয়ার মিডল ক্লাশ সোসাইটি কখনও উক্ত দোষ সকল বর্জিত ছিল।

"ইকনমিক ফ্রাসট্রেসান আর সেক্স অঙ্গাঙ্গি জড়িত।" চারু রায় বক্তৃতা করে বললে, "যুদ্ধোত্তর জার্মেনীতে এই হচ্ছে, জাপানে হচ্ছে। আজ বাংলাদেশেও যা ঘটছে, তার প্রথম ছবি আমি তুলব।"

একমাত্র বলাই ছাড়া এ গ্রন্থে পৌরুষ কাহারও নাই। সেই যথার্থ যুদ্ধ করিতেছে। ফলে তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের মনে নাড়া দেয়। তাহার বেগুন বেচিতে গিয়া পুলিশের লাথি খাওয়া আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই। রক্ত পড়িতেছে, তাহার মধ্যেও তাহার আশা ভরসা মরে নাই। পুনর্বার সকাল হইয়াছে, পুনর্বার সে উঠিয়াছে জীবন সঞ্চয় করিতে বাহির হইয়াছে। আইসক্রিম লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছে। তখন সেই বিধবার কথা "ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দাও" (২০৭ পৃষ্ঠা) সত্যই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের ক্ষমতার উপর অত্যন্ত অবিশ্বাসী। একথা আমরা অতি সহজেই বলিতে পারি যে এই পটভূমিকায় কতিপয় সগোত্রীয় চেনা-অচেনা লোক আনিয়া ভেল্কী লাগাইবার চেষ্টা না করিয়া সত্যই যদি বস্তিবাসীর দৈনন্দিন জীবন লইয়া লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি সাহিত্যের গর্ব হইত। পাঠকের মনের দিকে তাকাইয়া লেখার লোক বাঙলা দেশে অগণন।

পূর্বেই বলিয়াছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনেক কথাই আপনার অজ্ঞাতসারে লেখেন। সে কথা লইয়া যদি চিন্তা করিতেন তাহা হইলে সত্যই নূতন দিক লাভ করিতেন। একথা যদি তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইত যে তিনি গভীর চিন্তাশীল নন তাহা হইলে মানুষের সকল কিছু লইয়া অস্তিত্ব লইয়া সকল কিছু বুঝিয়া ফেলার ভান করিতেন না। নিষ্ঠার সহিত পুনর্বার চেষ্টা করিতেন।

গ্রন্থে বাস্তবকে তুলিয়া ধরিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সিফিলিস, এবরশন, মাসাজ ক্লিনিক আছে এবং তৎসহ প্রস্রাব বিষ্ঠা (লেখক বিষ্ঠার সাধারণ ব্যবহৃত নামটি লিখিতে সাহস পান নাই) ইত্যাদি আছে। তলপেটে লাথি মারা আছে, আরও নির্মমতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন "একটা জল-চৌকির ওপর বসে বিধু মাষ্টার চীৎকার করছিল। এক মাস পর আবার যে হাসপাতালে যাবে, সেই স্ত্রীলোকের এত রঙ্গ রস কেন, নেচে আগুন দেখতে যাওয়ার বল সে কোথায় পায়। না, অন্ধকারে নর্দমায় কি গাছের গুঁড়িতে ঠোকর খেয়ে গড়িয়ে মাটিতে পরে (ড়) abortion হয়ে মরত বলে মাষ্টার দুঃখ করত না, করছে না। দুঃখ তার একটিন বার্লির জন্যে।" অসম্ভব নির্মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। ইকনমিক ফ্রাসট্রেসানের সহিত সেক্স জড়িত। যাহা হউক ইহা হইতে আমাদের মনে হয় আগুন জব্দ হওয়ার পর লোকেদের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তায়, চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেখানে যে মানুষ অসহায় একথা ভালভাবেই লেখক লিখিয়াছেন।

অনেক সময় নাটকীয় পরিণতিকে ব্যাহত করিয়াছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাষা। ভাষা কাহিনীগত হয় নাই। বিশেষত কথোপকথনে দেখি সকলেই একরূপ কথাই বলিতেছে। বর্তমান চরিত্রগতরীতি কোথাও রক্ষিত হয় নাই। যথা—প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রুচি তাহার স্বামীকে পঞ্চাশ টাকা ধার করিতে পারে নাই বলিয়া বলিতেছে "একজন বন্ধু নেই তোমার কলকাতার শহরে।" "ছিল, যবে দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলাম, রুচি।" এই 'যবে' কথাটায় কি এমন দক্ষতার পরিচয় দিলেন তা বুঝিতে পারি না। ইত্যাকারে বহুক্ষেত্রে কথোপকথন অদ্ভুত বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

কমলকুমার মজুমদার

গঙ্গা— সমরেশ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ১২। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

তাৎক্ষণিকের চিত্তবৃত্তির প্রাবল্যে যতই তন্গত হওয়া যাক না কেন, উপন্যাস রচনায় তার গুরুত্ব কথঞ্চিৎ। এর ফলে সম্ভূত প্রেরণা কাব্যের উপকরণ হতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের নয়। বলা বাহুল্য, তার অর্থ যদি এই করা হয় যে, উপন্যাসের উপযুক্ত ঘটনা সর্বত্র বিশিষ্ট এবং অভিনব, তবে অনর্থের বিড়ম্বনাই বাড়বে বেশী। জীবন উপন্যাস রচনার ভিত্তি। কারণ মানুষের জীবন অনেকান্ত, সুধু জৈবিক প্রবৃত্তির অস্থির প্রবহমানে তা সচল নয়, দেহের অস্তিত্বের অতীত এক পরমের প্রতি উৎসারিত এবং ইঙ্গিতময়। মানুষের বৃত্তিগুলি অস্থির। এক স্থূল নিয়মের অনুবর্তী। তবু চেতনায় যদি বৃত্তির দাসত্বই কেবল বর্তমান থাকে, তবে সেই অধীন মনোভাব পরিবেশনযোগ্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ স্বাভাবিক। জীবনের ভিত্তি কেবলমাত্র জৈবিক, এই প্রত্যয়ে সমাসীন হলে আমাদের থামতে হয় কঙ্কালে গিয়ে। মানুষের এই সঙ্কীর্ণ পরিমাপ হলে জীবনের অতল রহস্যের অসংখ্য অন্বেষণ আর প্রয়োজন হয় না। এবং সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস অচিরাৎ জীববিজ্ঞানের গবেষণায় সমাপ্ত হত। মানুষের অন্য কোনো কথা, মনের সুদূরতম প্রকোষ্ঠেও স্থানলাভ করত না।

মানুষের জীবনের বিচিত্র রহস্যের সন্ধান করে বলেই উপন্যাস রচনা এক বিশেষ অর্থে স্বাশ্রয়ী। সে-ক্ষেত্রে জীবনের বোধ বহিরঙ্গের সীমানায় স্তব্ধ নয়। ঔপন্যাসিক সেজন্যই আর ঘটনার প্রবক্তা থাকেন না। একটু একটু করে, আঁচড় যতই সূক্ষ্ম হোক, যত স্বল্পই হোক না কেন, জীবনকে তিনি স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত করেন। এইভাবেই চরিত্রগুলির বিস্তৃতি ঘটে। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উপন্যাসের বিষয় তখন আর ঘটনা-কেন্দ্রিক নয়। চেতনার, বস্তুত বোধের নূতন উপকরণ। সেই উপকরণের উপল একটি-দুটি করে কুড়িয়ে আমরা উপন্যাসের শিল্পদর্শনটি বোধগ্রাহ্য করার চেষ্টা করি।

উপন্যাসে যে-ঘটনা সন্নিবেশিত হয়, যে-প্রেক্ষিত রচিত হয়, সাধারণ হল অথবা অসাধারণ হল, এমন প্রশ্ন বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ঘটনার যেটুকু আমাদের চেতনাশ্রয়ী, সেটুকুই প্রধান। তা থেকেই সম্ভব মৌল অভিব্যক্তির। আর এই অভিব্যক্তিই লেখকের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে উজ্জ্বল। আর তা রচনার মধ্য থেকেই স্ফুরিত। মনে হবে, একটি আলোকবিন্দু ক্রমশ বিস্তার লাভ করে তার পার্শ্ববর্তী সকল কিছুকে আলোকময় করে তুলেছে।

প্রাক্-উক্ত কথাগুলি সমরেশ বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস সম্পর্কে প্রযোজ্য। অধুনা যে-কজন তরুণ লেখকের উচ্চাশার ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে, তাদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত বেশী জনচিত্তজয়ের অধিকারী। আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে গঙ্গা ও গঙ্গায় যারা মাছ ধরে তাদের জীবন-সংগ্রাম দিয়ে। যাদের দলবদ্ধ যাত্রা সময় সময় সমুদ্রেও। পুব থেকে আসে এই মাছ-ধরার দল। মরশুমে, গঙ্গায়। মাছ ধরে, মহাজনের ঋণ শোধ করে। তাদের এই অভিযান স্বল্পকালস্থায়ী। তবু এরই মধ্যে সমগ্র উপন্যাসের পরিধি নির্ণীত। তাদের মনের গভীরে, যা শিল্প-চেতনার প্রধান উপকরণ, প্রবেশ না করে, তাদের জীবনের অন্য কিছুর প্রতি দৃকপাত না করে যেন বাইরের দরজায় এসে ক্লান্ত হয়ে লেখকের মন থেমে পড়ল। সমরেশ বসুর পরিভ্রমণ হয়েছে যেন একটি বৃত্তরেখার বাইরে, চারিপাশে। ফলে, অস্বাভাবিক হলেও দেখা যায় তাঁর উত্তরণ সম্ভব হয়নি। সমুদ্রে দলবদ্ধ মৎস্যজীবীতে

শুরু করে তিনি এসে স্তব্ধ হলেন যেন বদ্ধ জলাশয়ে—বিলাস আর হিমিকে নিয়ে। অথচ এই দুজনের অনুভূতি বা বোধ একেবারেই সমাজবহির্ভূত নয়।

লেখক এদের অনাহার, পরিণতিতে শুধুমাত্র ক্ষুৎপিপাসা এবং বয়সকালে সঙ্গমলোভেই আচ্ছন্ন দেখলেন। মাছ ধরতে গিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গ্লানি আর সংগ্রামও যার মধ্যে আছে, যা তারা লাভ করেছে তা কারও মনে নূতন পরিভাষার সৃষ্টি করল না, এটাই বড় আশ্চর্যের কথা। মনে হয় এ বুঝি লেখকের প্রত্যয়বোধের অভাবপ্রসূত।

অথচ তিনিই জানিয়েছেন, এদের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য 'অঠিক গুরু, বেঠিক গুরু, গুরু অগণন'-এর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যা আহরণ করলেন তা হল একটি বিশ্লিষ্ট রূপ। আসল রূপের সঙ্গতি তাঁর চোখে পড়ল না, যে-কারণে আমাদের অজ্ঞতায় ঈষৎমাত্র জ্ঞান-শলাকা বিদ্ধ হয় না, গঙ্গায় স্বল্প-দেখা এই মৎস্য-শিকারীদেরও মানুষ বলে ধারণা করা সম্ভব হয় না।

জীবন সম্পর্কে এই সীমাবদ্ধ ধারণার জন্যই লেখককে এসে থামতে হল মাত্র তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পাঁচু, বিলাস ও হিমি। কিন্তু এদেরও খণ্ডচিত্রই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এই ব্যর্থতা সম্পর্কে মনে হয় লেখকও সচেতন ছিলেন। সেই কারণে, বোধ হয় সেই কারণেই, বিলাস-হিমি ও তৎপূর্বে অমর্তের বৌ ও বিলাসের আখ্যানভাগটুকু সংযোজিত। আর এটুকুতে আশা করা যায় তিনি তাঁর পাঠকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হবেন।

আসলে বিলাস-হিমির মধ্যে স্থিতিলাভ করে লেখক নিজের উপন্যাসেরই সমাধি রচনা করলেন। মাছ-ধরা আর গঙ্গা, বাঁধাছাদি জাল ফেলা আর কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত স্ফটিক-স্বচ্ছ হয়ে আর উপস্থিত হল না। গঙ্গা-পাড় ঘোলাজলে অস্বচ্ছ হল। এমন প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় সমরেশ বসু সার্থক। তাঁর কৃতিত্ব পূর্বস্বীকৃত। তিনি যে চতুর লেখক তারও প্রমাণ মেলে হিমির সমুদ্র পাড়ি দেবার, বিলাসকে বিবাহ করার ইচ্ছে থেকে পিছিয়ে আসার মধ্যে।

'পায়ে মাথা ঠুকে বলল হিমি, সাহস পাইনে কো। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন-চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাত্রে আমার প্রাণ পুড়বে। তোমার নাগাল তো আমি পাব না।......

জীবনের ও মনের বিচিত্র বিড়ম্বনার অপমানে ও বিরহের ভারে ডাঙায় নেমে এল হিমি।' (পৃঃ ৩২৮-২৯)

উপন্যাসের শিথিল ভাষার চেয়েও মাঝে মাঝে যে-সকল শব্দ তিনি ইতস্তত ব্যবহার করেছেন, তা যে-কোনো ব্যক্তিরই লজ্জার কারণ হবে। আর সমস্ত উপন্যাসে এত অসংখ্য পুনরুক্তি কেন?

নৃপেন্দ্র সান্যাল